‘হিযবুল্লাহ’ সম্পর্কে কী জানেন?

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আলী আস-সাদিক

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

﴿ ماذا تعرف عن حزب الله ؟ ﴾

« باللغة البنغالية »

علي الصادق

ترجمة: ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

হিযবুল্লাহ সম্পর্কে কী জানেন?

ভূমিকা:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা 'আলার জন্য, যিনি উভয় জগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম নবী ও রাসূল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার ও সকল সাথীর উপর। অতঃপর:

বর্তমান শিয়া-রাফেযীরা মুসলিম উম্মার ত্রাতা বনেছে, যাদের ধর্ম আহলে বায়তের কথিত মহব্বতে সীমালঙ্ঘন করা, কুরআনুল কারিমে বিকৃতিতে বিশ্বাস করা, সাহাবিদের অভিসম্পাত করা, উম্মুল মোমেনিন বা সকল মুমিনের মা রাসূলের স্ত্রীদের উপর অপবাদ আরোপ করা, পূর্বপুরুষদের [সাহাবিদের] লানত করা, রাত-দিন তাদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়া ও মুসলিম জাতির সাথে প্রতারণা করা । তারা আজও প্রতারণাপূর্ণ নাম 'হিযবুল্লাহ' ও তার মিথ্যা শ্লোগানের আড়ালে মুসলিমদের গালমন্দ করে বিশ্বসভাকে জানান দিচ্ছে যে, তারাই মুসলিম উম্মার ত্রাতা ও অভিভাবক । অনেক নাদান মুসলিমকে আমরা জানি, যারা লেবাননি শিয়া সংগঠন 'হিযবুল্লাহ'র আসল স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ, বরং ধোঁকায় লিপ্ত। তাদের কারো অজ্ঞতা এতো প্রকট যে, তারা 'হিযবুল্লাহ'র প্রধান হাসান নাসরুল্লাকে হিরো জ্ঞান করে, তাকে

বাহবা দিয়ে তার মাথায়-হাতে চুমু খায় ও খেতে বলে। তারা হিযবুল্লাহ, হিযবুল্লাহর উদ্দেশ্য, হিযবুল্লাহর আকিদা ও নিষ্পাপ মানুষের রক্তে রঞ্জিত তার কালো ইতিহাস সম্পর্কে চরম অন্ধকারে কোনো সন্দেহ নেই। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, তিনি যথাযথ বলেছেন:

«إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية».

"নিশ্চয় ইসলামের বন্ধনগুলো একটি একটি করে খুলে যাবে, যখন ইসলামে এমন লোক প্রবেশ করবে, যে জাহিলিয়াত সম্পর্কে জানে না"।

আমরা যখন হিযবুল্লাহ ও তার প্রধান সম্পর্কে স্তুতি ও গুণগান শ্রবণ করি, তখন মনে পড়ে সে সময়ের কথা, যখন খোমেনি ইরানকে [শিয়াদের ধারণায়] 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র'! ঘোষণা করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিল। কতক আহলে সুন্নাহ তার বাগ্মীতাপূর্ণ কথায় ধোঁকা খেয়েছে। একটি [শিয়া] রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কেউ দূর ইরান সফর করে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তারা মনে করেছিল খোমেনি ইসলামি হুকুমত কায়েম করবে, কিন্তু তাদের মনে করা মিথ্যা প্রমাণিত হল, যখন তারা চাক্ষুষ দেখল, বিশ্বও প্রত্যক্ষ করল তার লক্ষ্য একটি শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা, তার প্রধান অভিপ্রায় ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি ইসলামি বিশ্বে শিয়া মতবাদের বিস্তার ঘটানো।

একটি বিষয় স্পষ্ট না করলেই নয়, ইসরাইল নামক ইয়াহূদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মুসলিম উম্মার শরীরে একটি বিষ ফোঁড়া বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের শরীর ও সম্পদে র বিয়োগ, ধ্বংস ও অনিষ্টের কারণে আমরা খুশি হই ও স্বস্তি বোধ করি, য তটুকুন হোক।

ইয়াহূদীরা নবী-রাসূলদের ঘাতক ও তাদের দুশমন। তাদের কালো ইতিহাসের পাঠকমাত্র জানেন তাদের লাঞ্ছনার জীবন ও মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে যুগে যুগে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, তবে এ পর্যন্ত জেনে বাস্তবতা ভুলে যাওয়া নিরাপদ নয়, অত্র ভূ-খণ্ডে শিয়া ইরানিদের কুমতলব সম্পর্কে জানাও জরুরি। তারা ইসরাইল প্রতিরোধের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ফিলিস্তিন মুক্ত করার প্রতারণার লেবাসে ইরান থেকে শুরু করে ইরাককে ক্ষতবিক্ষত করে লেবানন পৌঁছেছে।

তাই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে হিযবুল্লাহ নামক মুনাফিকদের সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্নের উত্তর লেখার মনস্থ করি, যেন তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় ও মুসলিম উম্মার সামনে তাদের মুখোশ খসে পড়ে। পুস্তকের শুরুতে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি, অতঃপর লেবানন সফরে অর্জিত আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন কিতাব ও লেখনী থেকে লব্দ জ্ঞানের উপর নির্ভর করছি।

এ কিতাব লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত পেশ করা, দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া ও মুসলিম উম্মার জন্য কল্যাণ কামনা করা, কারণ মুসলিম উম্মার অনেক সদস্য হিযবুল্লাহর প্রকৃত স্বরূপ ও তার আসল চেহারা সম্পর্কে অজ্ঞ, বরং ধোঁকায় পতিত। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি মুসলিমদের অবস্থা শুধরে দিন, দীনের সহি বুঝ দান করুন, কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে হিফাজত করুন। আল্লাহ তাদের নেতৃবর্গ ও আলেমদের সকল প্রকার কল্যাণের তৌফিক দিন। আহলে-সুন্নাহ ও সুন্নত অনুসারীদের সাহায্য করুন, বিদ ‘আত ও বিদ‘আতিদের ধ্বংস করুন। সত্যকে সত্য হিসেবে বুঝা ও তার অনুসরণ করার তৌফিক দিন এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে বুঝা ও তার থেকে বেচে থাকার তৌফিক দিন। আল্লাহর তৌফিক ব্যতীত আমার কোনো সাধ্য নেই।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক জগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত ব্যক্তিত্ব, আমাদের নবী ও আদর্শ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ এবং তার পরিবার ও সকল সাথীর উপর।

আলী আস-সাদিক
Ali.alssadiq@hotmail.com

শিয়া সংগঠন ‘হিযবুল্লাহ’ লেবাননির প্রতিষ্ঠাকাল

লেবাননের শিয়া সংগঠন ‘হিযবুল্লাহ’র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮২-ই. সনে, তবে রাজনৈতিক অঙ্গনে তার অনুপ্রবেশ ঘটে ১৯৮৫-ই. সালে। ইরানের মদদপুষ্ট সংগঠন حركة أمل الشيعية اللبنانية [লেবাননি শিয়াদের স্বার্থ বাস্তবায়নকারী আন্দোলন] থেকে ‘হিযবুল্লাহ’র জন্ম। প্রথমে মূল সংগঠনের নামানুসারে হিযবুল্লাহর নামকরণ করা হয় حركة أمل الشيعية [শিয়াদের স্বার্থ বাস্তবায়নকারী আন্দোলন]। অতঃপর বৃহৎ লক্ষ্যে এ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় أمل الإسلامية [ইসলামি স্বার্থ বাস্তবায়নাকরী আন্দোলন], যেন শিয়া সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের করে সমগ্র মুসলিম উম্মাকে তাতে শামিল করা যায়। কারণ حركة أمل الشيعية এর তৎপরতা লেবাননি শিয়াদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে ব্যাপক করে ‘আমালুল ইসলামিয়াহ’ নামকরণ করা হয়, যেন লেবানন ও অন্যান্য মুসলিম দেশে শিয়া মতবাদ প্রচারে ‘আমালুল ইসলামিয়া’কে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় । এ জন্য তারা জিহাদি গ্রুপের আকৃতি ধারণ করে, যেন মানুষ বোঝে তাদের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহ থেকে ইয়াহূদী আগ্রাসন প্রতিরোধ করা ও ইসলামের পবিত্র ভূমিসমূহ সংরক্ষণ করা।

তবে অতীতে আহলে সুন্নার উপর حركة أمل الشيعية যে ঘৃণ্য নির্যাতন ও আক্রমণ পরিচালনা করেছে, যার কালো দাগ এখনো মানুষ ভুলেনি, তার থেকে জন্ম নেওয়া ‘আমালুল ইসলামিয়া’ মুসলিম উম্মাহ থেকে বিদেশী [বিশেষ করে ইয়াহূদী] আগ্রাসন প্রতিরোধ করবে কারো বিশ্বাস হয়নি। এটা নতুন নামে পুরনো কার্য সম্পাদন করার ফন্দি সবাই বুঝে গেছে। এ থেকে সম্পূর্ণ নতুন নামে অপর একটি সংগঠনের জন্ম দেওয়া হল, যা বর্তমান ‘হিযবুল্লাহ’ নামে প্রসিদ্ধ”।[1]

নাম পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোককে হিরো বানানো হল। সংবাদ পত্রগুলো কতক কপট বীর বাহাদুর আবিষ্কার করল, যারা গতকালও সুন্নি মুসলিমদের উপর নিধনযজ্ঞ পরিচালনা করেছে। দক্ষিণ বৈরুতে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির “বারাজানাহ ক্যাম্পে” নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র সুন্নি মুসলিমদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। হলুদ সাংবাদিকতার কল্যাণে তারাই আজ বীর মুজাহিদ! সন্দেহ নেই, হিযবুল্লাহ বিদেশী আগ্রাসন প্রতিরোধ করবে এরূপ কল্পনা করা দিবাস্বপ্ন বৈ কিছু নয়, কারণ হিযবুল্লাহ মঞ্চে সাজানো শিয়াদের একটি নাটক, যা ব্যক্তি থেকে সমষ্টি পর্যায়ে সকল উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। বিশেষ করে যেসব

---

[1] দেখুন: আমাল ওয়াল মুখাইয়ামাতুল ফিলিস্তিনিয়াহ, (পৃ.১৮১)

মুসলিম দীন বোঝে না, সহি আকিদা বোঝে না, ইতিহাস পড়ে না, বরং মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারী পত্র-পত্রিকার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়; বিশুদ্ধ জ্ঞান, বাস্তব ঘটনা ও সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করে না, তারাই হিযবুল্লাহর প্রধান টার্গেট।

এভাবেই 'হিযবুল্লাহ'র জন্ম, যার উদ্দেশ্য أمل الشيعية থেকে আরো ব্যাপক আকারে মুসলিম উম্মার উপর ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করা, কারণ 'আমালে শিয়া'র কাজ ছিল রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতার আচ্ছাদনে শিয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা, কিন্তু হিযবুল্লাহর পরিধি তার চেয়েও বিস্তর। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মার উপর হিযবুল্লাহর ক্ষোভ, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, 'হরকতে আমাল' ও 'হিযবুল্লাহ' একই মুদ্রার এপিট ওপিট। তারা ক্ষোভে আহলে সুন্নার উপর দাঁত কিড়মিড় করে।

'হরকতে আমাল' ও তার প্রতিষ্ঠাতাদের পরিচয়

[উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল, 'হরকতে আমাল' থেকে হিযবুল্লাহর জন্ম। হরকতে আমালের সদস্যরাই তার প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক। তাই হিযবুল্লাহর আলোচনার পূর্বে 'হরকতে আমাল' ও তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে জানা জরুরি।]

‘হরকতে আমালে’র প্রতিষ্ঠাতা ইরানি বংশোদ্ভব মুসা সদর **১৯২৮ই.** তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তেহরান ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে **১৯৫৮ই.** সালে তিনি লেবানন যান। এক সরকারি অনুষ্ঠানে ফুয়াদ শিহাব[1] তাকে লেবাননের নাগরিকত্ব প্রদান করেন, ফলে সে তার নাগরিকত্ব লাভ করে, যদিও সে ইরানের সন্তান ইরানি।[2]

তিনি ছিলেন খোমেনির ছাত্র। খোমেনির সাথে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারা উভয়ে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। মুসা সদরের ভাগ্নির পাণি গ্রহণ করে খোমেনির ছেলে আহমদ। আবার খোমেনির নাতনির পাণি গ্রহণ করে মুসা সদরের ভাগিনা মুরতাজা তাবাতাবায়ি।

‘মুসা সদর’ দক্ষিণ লেবানন, বৈরুত ও বেক্কা প্রদেশে ‘হরকতে আমাল’ নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রথমে দেশের জাতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগী ছিল।

সিরিয়ার কোনো ‘নুসাইরি[3]’ প্রতিনিধি লেবাননে আগমন করলে ‘মুসা সদর’ তার ডান হাত হয়ে কাজ করত। সিরিয়ার নুসাইরি

---

[1] ফুয়াদ শিহাবের জন্ম ১৯/৩/১৯০২ই., তিনি লেবাননের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট, তার মেয়াদ ছিল ২৩/৯/১৯৫৮ই. থেকে ২২/৯/১৯৬৪ই. পর্যন্ত।

[2] দেখুন: আমাল ওয়াল মুখাইয়ামাতুল ফিলিস্তিনিয়াহ, (পৃ.৩১)

[3] নুসাইরী সম্প্রদায় সবচেয়ে খারাপ শিয়া সম্প্রদায়। তারা গুপ্তঘাতক দল।

সেনাবাহিনী যখন লেবাননে প্রবেশ করে, তখন ‘মুসা সদর’ দেশ প্রেমিক ইসলামি ব্যক্তিত্ব থেকে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ এজেন্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন | অতঃপর সে নিম্নের কাজগুলো দ্রুত সম্পাদন করে:

১. মুসা সদর নিজের অনুগত এক সেনা অফিসারকে আদেশ করেন, ফলে সে লেবাননি এরাবিক জাতীয় সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার সাথে মিলে নতুন এক বাহিনী গঠন করেন। অনুরূপ অপর সেনা অফিসার আহমদ মিমারি উত্তর লেবাননে লেবাননি এরাবিক সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার নুসাইরি সেনাবাহিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইতোপূর্বে খ্রিস্টান ক্যাথলিক শাখাভুক্ত ‘মুওয়ারানা’ সম্প্রদায়ের আতঙ্কের কারণ ছিল লেবাননি এরাবিক ফোর্স, কিন্তু মুসা সদরের এ কাণ্ডের কারণে তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, কারণ ইবরাহিম শাহিন ও অন্যান্য শিয়া সেনা অফিসারদের থেকে আভ্যন্তরীণ এ বিপদের আশঙ্কা তারা কখনো করেনি। অতঃপর মুসা সদর ‘হরকতে আমালে’র সদস্যদের নির্দেশ করেন যেন তারা জাতীয় সেনাবাহিনী

সিরিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বাশশার আল-আসাদ এর সেনাবাহিনী সবই নুসাইরী শিয়া সম্প্রদায়ের। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ইসলাম হাউজ এর ‘নুসাইরিয়া’ প্রবন্ধটি পড়ুন। www.islamhouse.com/409011 [সম্পাদক]

থেকে পৃথক হয়ে সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়। তারপর থেকে ‘মুসা সদর’ ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন ও সংস্থাসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

২. ৫/৮/১৯৭৬ই. সালে ফ্রান্সের এক সংবাদ সংস্থা থেকে জানা যায়, সিরিয়ান নুসাইরি সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন লেবাননের যেসব এলাকা রয়েছে, তাতে স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ‘মুসা সদর’ রোমের অর্থোডক্স, ক্যাথলিক খ্রিস্টান, ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের অপর গ্রুপ ‘মুওয়ারানা’ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও লেবাননের বেক্কা প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে রিয়াক এয়ার ফোর্সের হলরুমে এক বৈঠকে বসেন।

তারপর থেকে ‘মুসা সদর’ ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোকে দমন করা আরম্ভ করেন, দেখুন ১২/৮/১৯৭৬ই. তারিখের ফ্রান্সের সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোকে সে অপবাদ দেয় যে, তারা এরাবিক গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে, যার প্রথম সারিতে আছে লেবাননের সংবিধান। তার নিকট ইয়াহূদী আগ্রাসন বিরোধী ফিলিস্তিনি মুসলিমরা একটি সমস্যা, যারা ফিলিস্তিন ও লেবাননকে ইসরাইল মুক্ত করতে চায়, সে তার অনুগত শিয়াদের ফিলিস্তিনি সমস্যা মোকাবিলার আহ্বান জানায়।

ফিলিস্তিনিদের উপর মুসা সদরের অত্যাচার ছিল পীড়াদায়ক, স্বাধীনতাকামী একনেতা কায়রোতে সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, মুসা সদর খ্রিস্টান মুওয়ারানা গোষ্ঠী ও সিরিয়া সরকারের সাথে মিলে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

মুসা সদর ও তার দল সিরিয়া সরকারকে শুধু সহযোগিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং দাবিও জানিয়েছে যে, ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী হামলা বন্ধ করা হোক এবং তাদেরকে দক্ষিণ লেবানন থেকে বহিষ্কার করা হোক, এ জন্য দফায় দফায় সংঘর্ষও বাঁধে তার অনুগতদের সাথে। তারা 'সায়দা' নগরীতে সর্বাত্মক ধর্মঘট করে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র যোদ্ধাদের (মুজাহিদদের) দক্ষিণ লেবানন থেকে বিতাড়িত করার দাবি জানায়।

ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে মুসা সদরই সর্বপ্রথম দক্ষিণ লেবাননে ক্যাম্প তৈরির জন্য সরকারী জরুরি ফোর্স তলব করে, যেন ফিলিস্তিনিরা এতে জড়ো না হতে পারে এবং এখান থেকে ইসরাইল বিরোধী কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা না হয়। মুসা সদরের দাবি হচ্ছে, লেবাননের সাথে ইসরাইলের শান্তি চুক্তি রয়েছে, যা কোনোভাবেই ফিলিস্তিনিরা ভঙ্গ করতে পারে না।[1]

---

[1] দেখুন: আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-গরিব রচিত 'আমাল ওয়াল মুখাইয়ামাতুল ফিলিস্তিনিয়াহ': (পৃ.৩১-৩৪)

ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার এক সেনা অফিসার বলেন: “ইসরাইল ও লেবাননি শিয়াদের মাঝে সাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক নিরাপদ এলাকার শর্ত নেই, যেখানে ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা করা যাবে না। আমরা তাদের স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের সাথে আমাদের একপ্রকার সমঝোতা রয়েছে, যেভাবে হোক ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করতে হবে, যা দের কারণে হামাস ও জিহাদি গ্রুপ গুলো এখনো টিকে আছে”।[1]

মুসা সদর সবচেয়ে বেশী কাজ করে সিরিয়ার নুসাইরি সরকারের সাথে। এক সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তর লেবাননের নুসাইরি সম্প্রদায় তার কারণে শিয়া ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, সে তাদের জন্য একজন শিয়া জাফরি মুফতি নিয়োগ দিয়েছে। আবার যখন হাফেয আল-আসাদের পিতার মৃত্যুর সময় হল, সিরিয়ার সরকার মুসা সদরকে ডেকে পাঠালো। সে তার পিতাকে কতক মন্ত্র পাঠ করাল, যা তাদের মৃতদের মুমূর্ষু অবস্থায় পাঠ করানো হয়।

লেবাননি এরাবিক সেনাবাহিনী ও লেবাননে অবস্থিত ফিলিস্তিনি সশস্ত্র যোদ্ধারা যখন কোনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, শিয়াদের সামনে তারা নিজেদের পিঠ অরক্ষিত পায় । উদাহরণত যখন তারা

---

[1] দেখুন: ‘সাহিফাতু মায়ারিফ’ আল-ইহুদিয়াহ, তারিখ: ৮/৯/১৯৯৭ই.

বালাবাক্কা ও হারমালের নিকটস্থ এলাকায় নুসাইরিদের সাথে যুদ্ধে মশগুল ছিল, তখন শিয়া জাফরি মুফতি সুলাইমান ইয়াফুঈ গিয়ে নুসাইরিদের সাথে মিলে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়ে অসহায় ও নিরস্ত্র মুসলিমদের মাড়িয়ে বিজয় বেশে বালাবাক্কায় প্রবেশ করে। মুসা সদর এতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সে ‘হরকতে আমালে’র নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ করেছে যে, তারা বৈরুতের ‘নাবা’ ও ‘শিয়াহ’ এলাকায় মুওয়ারানা খ্রিস্টানদের প্রতিরোধ করবে না । তার এ কথার অর্থ বৈরুতের শিয়া অধ্যুষিত এলাকা সে মুওয়ারানাদের নিকট লিজ দিয়েছে, সেখান থেকে তারা যেভাবে ইচ্ছা সুন্নি মুসলিমদের হত্যা করবে, বন্দী করবে। সে একসময় বলত: “অস্ত্র পুরুষের সৌন্দর্য, নিশ্চয় আমরা বদলে দেওয়ার দল, আমাদের আন্দোলন কারবালার বালুতে মিশে যায়নি”।[1]

১৪০৫হি. রমদানে أمل الشيعية সংগঠন বৈরুতে ফিলিস্তিনি শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। এতে তারা সবধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে, পূর্ণ মাস তারা নিধনযজ্ঞ অব্যাহত রাখে, যতক্ষণ না শরণার্থীরা দামেস্কের তৎকালীন শাসক হাফেজ আসাদ ও তার বৈরুত প্রতিনিধি ‘নবীহ বারি’র সকল শর্ত মেনে নিয়েছে, তাদের উপর থেকে ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হয়নি।

---

[1] দেখুন: حزب الله من الحلم الأيديولوجي إلى الواقعية السياسية (পৃ.১৫৫০)

২০/৫/১৯৮৫হি. সোমবার রমদানের প্রথম রাতে শরণার্থী শিবিরে হামলা শুরু হয়। ‘হরকতে আমালে’র মিলিশিয়ারা ‘সাবরা’ ও ‘শাতিলা’ নামক দু’টি ফিলিস্তিনি শিবিরে হামলা করে । অতঃপর গাজার হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স ও স্টাফদের ধরে ‘আমালে’র স্থানীয় অফিস জালুল-এ নিয়ে আসে। শিয়া যোদ্ধারা কয়েকটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন রেড ক্রিসেন্ট ও রেড ক্রস সংস্থার চিকিৎসার সরঞ্জামাদি বহনকারী এম্বুলেন্সকে শরণার্থী শিবিরে প্রবেশে বাঁধা দেয়, হাসপাতাল থেকে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়।

২০/৫/১৯৮৫ই. সোমবার ভোর পাঁচটায় ‘সাবরা’ শরণার্থী শিবির কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলির শিকার হয় । একই দিন সকাল সাতটায় ‘বুরজুল বারাজেনাহ’ শরণার্থী শিবিরেও তার বিস্তার ঘটে। যখন ‘হরকতে আমালে’র নৃশংস হামলা নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে শিকার করছিল, তখন ‘নবীহ বারিহ’ লেবাননের ষষ্ঠ ব্রিগেডকে নির্দেশ করল আহলে সুন্নার বিপক্ষে ‘আমালে’র যোদ্ধাদের সাহায্য কর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ষষ্ঠ ব্রিগেড এসে চতুর্দিক থেকে ‘বুরজুল বারাজেনাহ’ শিবিরে গোলা বর্ষণ শুরু করল।

উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ ব্রিগেডের সবাই শিয়া। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবিরে তারা কামান ও রকেটের হামলা করে। ষষ্ঠ ব্রিগেডকে ১৯৮৪ই.

সালের এপ্রিল থেকে এসব অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে সজ্জিত করার পর এই প্রথমবার তার প্রয়োগ করল, তাও আহলে সুন্নার বিরুদ্ধে।

১৮/৬/১৯৮৫ই. তারিখে 'হরকতে আমালে'র আগুনে বিধ্বস্ত শিবির থেকে ফিলিস্তিনিরা মুক্ত হয়। পুরো একমাস ভয়-ভীতি-আতঙ্ক ও ক্ষুধার্ত জীবনে তারা কুকুর ও বিড়াল পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। ৯০% বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। নানা তথ্য থেকে তিন হাজার একশো হতাহতের সংখ্যা জানা যায়। ১৫-হাজার শরণার্থী বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যায়, যা মোট আশ্রয়প্রাপ্তদের প্রায় ৪০%।

শরণার্থী ক্যাম্পে 'হরকতে আমালে'র নৃশংস হত্যাকাণ্ড ছিল খুব বেদনাদায়ক, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।[1] নিম্নে তার কয়েকটি গোপন তথ্য উপস্থাপন করছি:

---

[1] খোমেনির পক্ষ থেকে এসব হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে কোনো প্রতিবাদ বা অসন্তুষ্টি ছাপা হয়নি, লাগাতার এসব নৃসংশতা বন্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সে। শায়খ 'আসাদ বিউদ তামিমি' 'গাজি আব্দুল কাদের হুসাইনি'কে সাথে নিয়ে খোমেনির নিকট ইরানে যান, যেন তিনি গণহত্যা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ব্যবস্থা নিতে অস্বীকার করেন! অতঃপর তারা ভাইস প্রেসিডেন্ট মুনতাজিরির নিকট যান, তিনি গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে ফতোয়া দেন, যে কারণে খোমেনি তার উপর খুব ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে প্রেসিডেন্সি কক্ষ থেকে সরিয়ে দেয়! দেখুন: মুহাম্মদ আসাদ বুউদের প্রবন্ধ: ماذا يجري في

১. ‘ইতালি রিপাবলিকান’ পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘সাবরা ও ‘শাতিলা’র ম্যাসাকার ছিল জঘন্যতম নৃশংসতা, যা ‘হরকতে আমালে’র সদস্যরা সংগঠিত করেছে।

২. ২৬/৫/১৯৮৫ই. তারিখে ‘আমালে’র শিয়ারা একটি শরণার্থী ক্যাম্প গুড়িয়ে দিলে শত শত বৃদ্ধ, শিশু ও নারী হতাহত হয়।

৩. ‘সানডে টেলিগ্রাফ’ পত্রিকার প্রতিবেদক বলেন: বৈরুতের হাসপাতালে অনেক ফিলিস্তিনি মৃতদেহের গলা কাটা ছিল।

৪. আহতদের হত্যা করার দৃশ্য দেখে প্রতিবাদ করায় এক নার্সকেও শিয়ারা হত্যা করে।

৫. দু’জন সাক্ষীর বরাতে ‘অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস’ সংস্থা জানায় যে, আট দিনে ‘আমাল মিলিশিয়া রা’ তিনটি শরণার্থী শিবির থেকে

لبنان “লেবাননে কি ঘটছে”, যা ২৭/৮/১৪২৭হি. موقع مفكرة الإسلام ওয়েব সাইট প্রকাশ করেছে। উস্তাদ ফাহমি হাওয়িদি বলেন: “ইমাম খোমেনি ফিলিস্তিনি স্মরণার্থী শিবিরে ‘হরকতে আমালে’র হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেন। তিনি ২০-জনু, ১৯৮৫ই. সালে যখন ঈদের খুতবা পাঠ করেন, স্মরণার্থী শিবিরে ফিলিস্তিনিদের উপর পরিচালিত যুদ্ধের প্রতি ঈঙ্গিতও করেননি। তার একাধিক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন: নিশ্চয় ইমাম বিভিন্ন জাতির মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করেন, এ হিসাব তার নিকট, তিনি ভালো জানেন তার ভারসাম্যের বিষয়! দেখুন: ফাহমি হাওয়িদি রচিত إيران من الداخل ‘ইরান মিনাদ দাখিল’: (পৃ.৪০৪)

কয়েক ডজন আহত ও বেসামরিক লোক ধরে এনে হত্যা করেছে।

৬. দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, তারা 'হরকতে আমালে'র যোদ্ধা ও ষষ্ঠ ব্রিগেডের সৈনিকদের দেখেছে, গাজা হাসপাতাল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৪৫ এর অধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে অনেকে আহতও ছিল।

৭. এক ফিলিস্তিনি নারী লাশের দীর্ঘ সারি দেখে চিৎকার করে উঠেন: "ইয়াহূদীরাও তাদের চেয়ে ভালো"। অপর নারী নাক ঢেকে লাশের সারিতে ভাইয়ের লাশ তালাশ করছেন... চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে হটাৎ চিৎকার করে উঠলেন: নিশ্চয় এই তো সে (আমার ভাই), কিন্তু দেখছি পোকায় তার শরীর খাচ্ছে... এরূপ আরো অনেক মৃতদেহ ছিল যাতে মাছি ভনভন করছে।

৮. 'সাবরা শিবির' পতনের পর 'আমালে'র যোদ্ধারা পশ্চিম বৈরুতের রাস্তায় স্বাধীনতা দিবসে মার্চ করার সময় শ্লোগান দেয়: لا إله إلا الله العرب أعداء الله "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আরব হল আল্লাহর দুশমন"।[1] 'আমালে'র অপর সদস্য অস্ত্র হাতে

---

[1] দেখুন: الوطن الكويتية তারিখ, ৩৬/১৯৮৫ই. أمل والمخيمات الفلسطينية থেকে সংগৃহীত, (পৃ.৯৯)

বলে: “আমি হত্যা করেই যাব, যত দিন লাগবে লাগুক, যতক্ষণ না ফিলিস্তিনিরা লেবানন থেকে নিঃশেষ হয়”।

৯. ৪/৬/১৯৮৫ই. তারিখ কুয়েতি সংবাদ সংস্থা ও ৩/৬/১৯৮৫ই. তারিখ ‘আল-ওয়াতান’ ম্যাগাজিন প্রচার করে: “আমালে”র যোদ্ধারা ‘সাবরা’ শরণার্থী শিবিরে পরিবারের সামনে থেকে ২৫-যুবতীকে অপহরণ করে তাদের শ্লিলতাহানির মত জঘন্য অপরাধ করেছে”।

এসব ডকুমেন্ট থেকে আমরা নিশ্চিত ‘হরকতে আমালে’র মূল লক্ষ্য ফিলিস্তিনি সুন্নিদের অস্তিত্বকে নিঃশেষ করা, যে সুন্নি ফিলিস্তিনিরা দখলদার ইয়াহূদীদের থেকে নিজেদের মাতৃভূমি মুক্ত করতে চায়। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে দ্বাদশ ইমামিয়া আকিদা তার অনুসারীদের অন্তরে আহ লে সুন্নার প্রতি হিংসা-ক্ষোভ ও প্রতিশোধ স্পৃহা জন্ম দিয়ে থাকে, তাই তাদেরকে তারা কাফের ও ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের সমতুল্য জ্ঞান করে, বরং তাদের চেয়েও বড় কাফের মনে করে।

তাওফিক মাদিনি বলেন: “হরকতে আমালে’র অন্তর্নিহিত কার্যক্রম হচ্ছে সশস্ত্র ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করা, কারণ তারা শিয়া

সমাজের নিরাপত্তার অন্তরায়। তাদের কারণে ইসরাইল দক্ষিণ লেবাননে হামলার সুযোগ পায়”।[1]

ইসরাইলি সৈন্যরা যখন লেবানন ঢুকে শিয়াদের মদদে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামীদের দমন করে, তখন শিয়ারা দক্ষিণ লেবাননে ইয়াহূদী সৈন্যদের ফুল ও তোরণ দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়![2]

‘হরকতে আমালে’র এক নেতা (হায়দার দায়েখ) বলেন: “আমরা ইসরাইলের দিকে অস্ত্র তাক করে ছিলাম, কিন্তু ইসরাইল আমাদের জন্য তার হাত প্রসারিত করল ও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। তারা ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী ওহাবিদেরকে দক্ষিণ লেবানন থেকে হটাতে আমাদের অনেক সাহায্য করেছে”।[3]

---

[1] দেখুন: أمل وحزب الله في حلبة المجابهات (পৃ.৮১)

[2] সুবহি তুফাইলি الشرق الأوسط কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে এরূপ বলেছেন। দেখুন, সংখ্যা: (৯০৬৭), ২৯-রজব, ১৪২৪হি. মোতাবেক: ২৫-সেপ্টেম্বর, ২০০৩ই. এ বিষয়টি হিযবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল হাসান নাসরুল্লাহও নিশ্চিত করেছেন। দেখুন: سجل النور (পৃ.২২৭), যা الوحدة الإعلامية لحزب الله থেকে প্রকাশিত। [আদেল রউফ রচিত, عراق بلا قيادة থেকে সংগৃহীত, (পৃ.২৬৬)

[3] দেখুন: হায়দারের সাথে এক সাংবাদিকের সাক্ষাতকার, যা ২৪/ ১০/ ১৯৮৩ই. তারিখে مجلة الأسبوع العربي প্রকাশ করেছে।

লেবাননে হিযবুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃবৃন্দের পরিচয়

- লেবাননের খোমেনি খ্যাত মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ, সুবহি তুফাইলি, হাসান নাসরুল্লাহ, ইবরাহিম আমিন, আব্বাস মুসাভি, নায়িম কাসেম, জুহাইর কাঞ্জ, মুহাম্মদ উজবেক ও রাগেব হারব প্রমুখদের দ্বারা ইরান নতুন এ সংগঠনটি তৈরি করে, যার নাম হিযবুল্লাহ।[1] তারা সবাই ‘হরকতে আমালে’র সদস্য ছিল। ‘আমাল’ ও ‘হিযবুল্লাহ’ একত্র কাজ করার কথা থাকলেও কর্তৃত্ব নিয়ে উভয়ের মাঝে অতি দ্রুত মতভেদ দেখা দেয়, উভয়ে শিয়া অধ্যুষিত এলাকাসমূহে নিজ নিজ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মরিয়া হয়ে উঠে। বহু ঘটনা ও হতাহতের পর হিযবুল্লাহ দক্ষিণ লেবাননের অধিকাংশ এলাকায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়, ধীরে ধীরে তার সমর্থন বাড়তে থাকে, কারণ ইরানের অর্থায়নে সে শিয়াদের মাঝে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ করার সুযোগ পায়। হিযবুল্লাহ আজ মুসলিম উম্মার জন্য বড় হুমকি ও কঠিন বাঁধা। তার বাহ্যিক রূপ আল্লাহর দুশমন ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করা, কিন্তু প্রকৃত রূপ হচ্ছে শিয়া মতবাদের প্রসার ও মুসলিম দেশসমূহে খোমেনির বিপ্লব রপ্তানি করা।

---

[1] দেখুন: حزب الله من الحلم الأيديولوجي إلى الواقعية السياسية لغسان العزي (পৃ.৩২) এবং وأمل والمخيمات الفلسطينية ص 179. (পৃ.১৭৯)

'হিযবুল্লাহ' ও 'আমাল' উভয় ইরানের নির্দেশে পরিচালিত হয়

বাড়াবাড়ি হবে না যদি আমরা বলি, লেবাননের ভূমিতে হিযবুল্লাহ একটি ইরানি সংগঠন। হিযবুল্লাহর সংবিধানে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে "আমরা কারা এবং আমাদের উদ্দেশ্য কি" শিরোনামে, সেখানে সে নিজের প্রসঙ্গে বলেছে: "আমরা হিযবুল্লাহর সদস্য, যার একাংশকে আল্লাহ ইরানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ফলে নতুন করে দুনিয়ার বুকে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের গোড়া পত্তন হয়েছে। আমরা হিকমত ও ইনসাফপূর্ণ অভিন্ন নেতৃত্বে বিশ্বাসী, যার ধারক হবেন সকল শর্তের অধিকারী একজন ফকিহ। বর্তমান যুগে সেই ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম আয়াতুল্লাহ উজমা রুহুল্লাহ মুসাভি খোমেনি। তিনি মুসলিম জাগরণের পুরোধা ও নতুন ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী। ১৯৮৭ই. সালে হিযবুল্লাহর অপর নেতা ইবরাহিম আমিন এ কথাই ব্যক্ত করেন ভিন্নভাবে, তিনি বলেন: "আমরা বলি না যে, আমরা ইরানের একটি অংশ, বরং লেবাননে আমরা ইরান এবং ইরানে আমরা লেবানন"।[1]

হাসান নাসরুল্লাহ ও হিযবুল্লাহর পরিচয় এবং হরকতে আমালের সাথে তার সম্পর্ক

---

[1] দেখুন: জারিদাতুন নাহার: ৫/৩/১৯৮৭ই.

আরবের খোমেনি হাসান আব্দুল করিম নাসরুল্লাহর জন্ম ২১ আগস্ট ১৯৬০ই.। সর্বপ্রথম তাকে 'বাযুরিয়াহ' শহরের অন্তর্গত 'সুওয়ার' জেলা র 'হরকতে আমালে'র দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ই. সালে শিয়া ইমামিয়ার ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য তিনি নাজাফ যান। ১৯৮২ই. সালে তাকে বেক্কা প্রদেশে 'আমালে'র রাজনৈতিক প্রধান ও কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য করা হয়। ইত্যবসরে সে 'আমাল' থেকে পৃথক হয়ে হিযবুল্লাহর সাথে যোগ দেয়। ১৯৮৫ই. সালে তাকে হিযবুল্লাহর বৈরুত শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়, অতঃপর ১৯৮৭ই. সালে তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়। ১৯৯২ই. সালে সাবেক সেক্রেটারি আব্বাস মুসাভি অপহৃত হলে তাকে সেক্রেটারি করা হয়, অতঃপর ১৯৯৩ই. ও ১৯৯৫ই. দু' মেয়াদের জন্য তাকে পুনরায় নির্বাচিত করা হয়।[1]

'হরকতে আমাল' এর সাথে হাসান নাসরুল্লাহর সম্পর্ক:

'আমালে'র প্রতিষ্ঠাতা মুসা সদরের সাথে খোমেনির গভীর সম্পর্ক ছিল, যা আমরা পূর্বে প্রমাণ করেছি।

---

[1] দেখুন: مجلة الشاهد السياسي পত্রিকার (১৪৭) নং সংখ্যায় হাসান নাসরুল্লার প্রদত্ত সাক্ষাতকারের শুরুতে তার জীবনের এসব তথ্য রয়েছে। তারিখ: ৩/১/ ১৯৯৯ই.

৮/১০/১৯৮৩ই. সালে জাফরি (শিয়া) মুফতি আব্দুল আমির কিবলান ‘শিয়া উচ্চ পরিষদ’ থেকে ঘোষণা করেন: নিশ্চয় ‘হরকতে আমাল’ শিয়াদের জন্য মেরুদণ্ড স্বরূপ। ‘আমাল’ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমরা সেটাকে ‘শিয়া উচ্চ পরিষদে’র সিদ্ধান্ত মনে করব। অনুরূপ ‘শিয়া উচ্চ পরিষদ’ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ‘আমাল’ সেটা আঁকড়ে ধরবে”।[1]

‘আমাল’ শিয়াদের শিরোমণি খোমেনির নিকট বায়‘আত গ্রহণ করে তাকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের নেতা স্বীকার করেছে।[2]

‘হরকতে আমাল’ এর প্রতি এ সাহায্য-সহযোগিতা তখনই আসে যখন ‘আমাল’ থেকে বের হয়ে তা ‘আমালুল ইসলামিয়া’ রূপ লাভ করে, আর তারও পরে সেটা ‘হিযবুল্লাহ’ নামে আত্মপ্রকাশ লাভ করে ও দ্বন্দ্বে ঝড়িয়ে পড়ে।

‘হরকতে আমালে’র সহ-সভাপতি হুসাইন মুসাভি ‘আমাল’ থেকে নিজেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে ‘আমালুল ইসলামিয়া’ গঠন করে, পরবর্তীতে যা হিযবুল্লাহ নাম গ্রহণ করে।[3]

---

[1] দেখুন: مجلة المستقبل (৩৪৬), তারিখ: ৮/১০/১৯৮৩ই. সংগৃহীত: أمل والمخيمات الفلسطينية গ্রন্থ থেকে (পৃ.১৮৪)

[2] দেখুন: مجلة الايكونوميست সংখ্যা ৪/৫/১৯৮২ই.

[3] দেখুন: حزب الله رؤية مغايرة (পৃ.১১৭-১২২), এবং حزب الله من الحلم الإيديولوجي إلى الواقعية السياسية (পৃ.২৩, ৫৩-৫৬)

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, সশস্ত্র আন্দোলন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেবাননে ইরানি এজেন্ডা বাস্তবায়ন থেকে ‘হরকতে আমাল’ বেশী দূরত্বে ছিল না।

এই হচ্ছে ‘হিযবুল্লাহ’; কতক আহলে সুন্নাহ না জেনে হিযবুল্লাহর পক্ষ নিয়ে থাকে। তারা হাসান নাসরুল্লার স্বরূপ ও ফিলিস্তিনে আহলে-সুন্নাহ হত্যায় তার সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানে না। কারণ, সে মিথ্যার আড়ালে নিজেকে ফিলিস্তিনিদের পক্ষা বলম্বনকারী ও তাদের সাহায্যকারী হিসেবে প্রকাশ করেছে।

হাসান নাসরুল্লাহ সম্পর্কে জানার জন্য বেশী তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন নেই, এতটুকুন জানাই যথেষ্ট যে, সে জাফরি শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়ার অন্তর্ভুক্ত, যাদের নিকট আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপায় হচ্ছে সাহাবিদের গালমন্দ করা।

শায়খ ইউসুফ কারদাভি এক সাক্ষাতকারে বলেছেন: হাসান নাসরুল্লাহ কট্টর শিয়া।[1]

---

[1] দেখুন: جريدة الوطن পত্রিকা, সংখ্যা: (২১৬৫), তারিখ: ৩/৯/২০০৬ই. এ সাক্ষাতে শায়খ আরো বলেছেন যে, অত্র এলাকায় শিয়াদের বিস্তার খুব বিপজ্জনক, বিশেষ করে মিসরে। শিয়া সংগঠনগুলো ইরাকে সুন্নী মুসলিমদের হত্যা করছে, সুন্নীদের নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে ইরাককে সুন্নী মুক্ত করার ঘৃণ্য পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

তাদের দেখে অবাক লাগে, যারা হিযবুল্লাহকে সমর্থন দেয় ও তাকে সাহায্য করে, অথচ সে সাহাবি ও মুমিনদের বড় শত্রু। সত্যিকার অর্থে যদি হাসান নাসরুল্লাহ ইসরাইলের জন্য হুমকি হত, তাহলে সে কিভাবে লেবাননের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম চষে বেড়ায়, ইসরাইলের বিষোদগার করে বেতার-যন্ত্র ও টেভির পর্দায় সাক্ষাতকার দেয়। বিশাল জনসভায় তাকে হুমকি দেয়, যেসব সভার দিন-তারিখ ও স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে, অথচ ইসরাইল তাকে কিছু বলে না, কোনো মিসাইল তার গাড়ি, বাড়ি বা জনসভাকে লক্ষ্য ছুড়ে না, পক্ষান্তরে যার থেকে সুন্নিরা কোনোভাবেই নিরাপদ নয়?

হে মুসলিম ভাই, শিয়াদের এ নোংরা কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রতারিত হবেন না, যারা চায় কথার দ্বারা মুসলিমদের অন্তরে জায়গা করে নিতে, অথচ 'আমাল' সংস্থার দ্বারা সংঘটিত সে কালো ইতিহাস তা এখনো আমাদের স্মৃতিতে জাগরুক রয়েছে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে শত-শত আহলে সুন্নাহকে হত্যা করেছিল! 'হরকতে আমাল' সংস্থাটির এসব অপকর্ম ও লাঞ্ছনাকর কর্মকাণ্ডের পর কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এ সংস্থাটিকে বিশ্বাস করা, কিংবা তার কোনো বিষয় গ্রহণ করা, অথচ এ সংস্থা থেকেই হিযবুল্লাহর জন্ম, অতএব মুসলিম কিভাবে এটিকে বিশ্বাস করবে?!

কিছুকাল পূর্বে যদিও ‘আমাল’ ও ‘হিযবুল্লাহ’ হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু এ কারণে তারা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং আদিকাল থেকে বাতিল পরস্পর এভাবেই চলে আসছে। আল্লাহ তা ‘আলা তাদের দোসর ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ بَأۡسُهُم بَيۡنَهُمۡ شَدِيدٞۚ تَحۡسَبُهُمۡ جَمِيعٗا وَقُلُوبُهُمۡ شَتَّىٰۚ ١٤ ﴾ [الحشر: ١٤]

“তাদের পরস্পরের মাঝে তাদের ঝগড়া খুব কঠিন ও বীভৎস”।[1] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿ وَأَلۡقَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ٦٤ ﴾ [المائدة: ٦٤]

“আর আমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি” ।[2] অন্যত্র তিনি তাদের অপর দোসর খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ١٤ ﴾ [المائدة: ١٤]

“ফলে আমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দিয়েছি”।[3]

---

[1] সূরা হাশর: (১৪)

[2] সূরা মায়েদা: (৬৪)

[3] সূরা মায়েদা: (১৪)

হিযবুল্লাহ ও তার প্রতিষ্ঠাতাদের আকিদা

হিযবুল্লাহ ও তার প্রতিষ্ঠাতারা শিয়া ইমামিয়া আকিদায় বিশ্বাসী। তারা নিজেদেরকে ‘জাফরি শিয়া’ পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাদের কতক ভ্রান্ত আকিদা নিম্নরূপ, যেমন:

- ইমামদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি:

শিয়া রাফেযীরা আহলে বাইতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে, তাদেরকে নিষ্পাপ দাবি করে, এবং তারা অবশ্যই গায়েব জানে বিশ্বাস করে। তাদের দাবি, দ্বাদশ ইমামগণ যখন যা জানতে চান জানতে পারেন, তারা জানেন কখন মারা যাবেন। তারা স্বীয় ইচ্ছা ব্যতীত মারা যান না।[1]

শিয়া ইমামিয়াদের দাবি তাদের ইমামগণ নবীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত। মাজলিসি ‘মিরআতুল উকুল’ গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করেছেন।[2] তাদের বিশ্বাস ইমামগণ মৃতদের জীবিত করেন।[3] তারা আরো বিশ্বাস করে যে, আলি ইবনে আবি তালিব কম্পনকারী, তিনি বজ্র, তিনি নদীসমূহ প্রবাহিত করেন, গাছের পাতা বিদীর্ণ করেন, তিনি

---

[1] উসুলুল কাফি লিল কুলাইনি: (১/২৫৮)

[2] উসুলুল কাফি লিল কুলাইনি: (২/২৯০)

[3] দেখুন: مدينة المعاجز لهاشم البحراني এ কিতাবে অনুরূপ আরো অনেক কুসংস্কার রয়েছে।

অন্তর্যামী, তিনি সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী, যার দ্বারা তাকে আহ্বান করা হয়।[1] তাদের এসব আকিদা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

- কুরআনুল কারিমে তাদের আকিদা:

হাসান নসরুল্লাহসহ শিয়াদের বিশ্বাস সাহাবিগণ কুরআনুল কারিম বিকৃত করেছেন। ইমামগণ ব্যতীত কেউ পূর্ণ কুরআন জমা করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তা 'আলার নাযিলকৃত হুবহু কুরআন আলি ইবনে আবি তালিব ও তার পরবর্তী ইমামগণ ব্যতীত কেউ জমা কিংবা হিফজ করতে সক্ষম হয়নি।[2] তাদের দাবি: অসীগণ ব্যতীত

---

[1] দেখুন: (مشارق أنوار اليقين) لرجب البرسي (পৃ.২৬৮)

[2] কুরআনুল কারিমের বিকৃতির উপর শিয়ারা একাধিক কিতাব রচনা করেছে, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কিতাব হচ্ছে শিয়া মুহাদ্দিস মির্জা হুসাইন নুরি তাবরাসি রচিত فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربّ الأرباب এ ছাড়া আরো অনেক গ্রন্থে তারা এ আকিদা প্রকাশ করেছে, যদিও তারা প্রকাশ্যে এ আকিদা অস্বীকার করে, কিন্তু আমরা তাদের কাউকে দেখিনি উক্ত কিতাব ও তার লেখক থেকে সতর্ক করেছেন। তারা এমন কোনো ফতোয়া প্রকাশ করেনি, যেখানে কুরআনে বিকৃতি বিশ্বাসকারীকে কাফের বলা হয়েছে, অথচ কুরআন তাদের নিকট 'সিকলুল আকবার'। যদিও আলি ও তার পরবর্তী ইমামদের ইমামত অস্বীকারকারীকে তারা কাফির ও গোমরাহ বলে, বরং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সামান্য কুণ্ঠাবোধও করে না, অথচ ইমামগণ 'সিকলুল আসগর' বা ছোট সিকল । এটা কেমন বৈপরিত্ব!? বড়

কেউ বলতে পারে না আমার নিকট বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল কুরআন রয়েছে।[1] তারা আরো বলে যে, জিবরীল মুহাম্মদের নিকট যে কুরআন নিয়ে এসেছেন, তার আয়াত সংখ্যা সতেরো হাজার।[2] তাদের প্রখ্যাত আলেম নিয়ামাতুল্লাহ জাযায়েরি বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইমামগণ সালাত ও অন্যান্য ইবাদতে নিজ অনুসারীদের প্রচলিত কুরআন পড়া ও তার উপর আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন, যে পর্যন্ত আমাদের সাহেবুজ্জামান[3] বের না হন। তিনি আসলে এ কুরআন মানুষের হাত থেকে আসমানে চলে যাবে এবং প্রকৃত কুরআন বের হবে, যা আমিরুল মোমেনিন লিখেছেন, অতঃপর তাই পড়া হবে এবং তার উপর আমল করা হবে।[4]

- ইমামগণ নিষ্পাপ ও নেতৃত্বের হকদার:

রাফেযীরা তাদের দ্বাদশ ইমামকে নিষ্পাপ, নেতৃত্বের হকদার ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত দাবি করে। এ আকিদা যারা পোষণ করে না,

---

সিকলকে অস্বীকারকারী কাফির হয় না, কিন্তু ছোট সিকলকে অস্বীকারকারী কাফির হয়?!

[1] উসুলুল কাফি, লিল কুলাইনি: (১/২৫৮)

[2] দেখুন: উসুলুল কাফি লিল কুলাইনি: (২/৩৬৩)

[3] [তাদের তথাকথিত পাহাড়ের গুহায় পলাতক ইমাম] সম্পাদক।

[4] দেখুন: الأنوار النعمانية (পৃ.২/৩৬৩) এসব বর্ণনাকে মজলিসি তার ‘মিরআতুল উকুল’ গ্রন্থে সহি বলেছেন।

তাদের নিকট তারা কাফের, বিশেষ করে প্রথম তিন খলিফা আবু বকর, ওমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম। কারণ, তাদের বর্ণনা মতে তারা আলি ইবনে আবু তালিব থেকে খিলাফত ছিনিয়ে নিয়ে কাফের ও মুরতাদ হয়ে গেছে, (আল্লাহ তার উপর ও তার সকল সাহাবির উপর সন্তুষ্ট হোন।) তাদের দৃষ্টিতে আমল কবুলের পূর্বশর্ত আলি ইবনে আবি তালিবের খিলাফতে বিশ্বাস করা, অন্যথায় কোনো মুসলিমের আমল গ্রহণযোগ্য নয়, যে কেউ হোক। তাই শিয়া আলেম মাজলিসি স্বীয় কিতাব ‘বিহারুল আনওয়ার’ গ্রন্থে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন: ‘বিলায়াত ব্যতীত আমল গ্রহণযোগ্য নয়’ শিরোনামে।[1]

- সাহাবি ও উম্মুল মোমেনিন সম্পর্কে তাদের আকিদা:

শিয়াদের বিশ্বাস আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার সবচেয়ে বড় উপায় তিন খলিফা আবু বকর, ওমর ও উসমানকে লানত করা। তারা আরো লানত করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে।[2] উম্মুল মোমেনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তারা জেনার অপবাদ দেয়।[3] তারা

---

[1] শিয়াদের মূল আটটি হাদিস গ্রন্থের এটা একটা গ্রন্থ।

[2] দেখুন নুরুল্লাহ মুরআশি রচিত ‘ইহকাকুল হক’: (১/৩৩৭)

[3] দেখুন জয়নুদ্দিন আমেলি রচতি: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم (৩/১৬৫)

বলে হাফসা ও আয়েশা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল ।[1] তারা সাত অথবা দশজন সাহাবি ব্যতীত সবাইকে লানত করে ও কাফের বলে। তাদের বিশ্বাস নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সব সাহাবি মুরতাদ হয়ে গেছে। [নাউযুবিল্লাহ]

- অন্যান্য মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস:

শিয়া রাফেযীরা ঢালাও ভাবে মুসলিমদের সকল জমাতকে কাফের বলে। শিয়া আলেম আব্দুল্লাহ শিব্‌র 'হাক্কুল ইয়াকিন ফি মারেফাতি উসুলিদ্দিন' কিতাবে এ মাসআলায় ইমামিয়াদের ঐকমত বর্ণনা করেছেন। শায়খ 'মুফিদ' বলেন: ইমামিয়ারা এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো ইমামের ইমামত অথবা আল্লাহর ফরযকৃত তাদের আনুগত্য অস্বীকারকারী কাফের, গোমরাহ ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অপর জায়গায় তিনি বলেন: ইমামিয়ারা এ ব্যাপারে একমত যে, বিদআতিরা সবাই কাফের, আলি ইবনে আবি তালিব তাদের উপর বিজয়ী হবেন, তাদেরকে দাওয়াত দিবেন, তাদের সামনে প্রমাণ পেশ করবেন এবং তাদের থেকে তওবা তলব করবেন, যদি তারা তওবা করে সত্য গ্রহণ করে ভালো, অন্যথায় মুরতাদ হিসেবে

---

[1] দেখুন: নাজাহ তায়ি রচিত কিতাব: من قتل النبي

তাদের সবাইকে তিনি হত্যা করবেন। এ অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী জাহান্নামী।[1]

শিয়া আলেম ইউসুফ বাহরানি বলেন: হকপন্থীদের বিরোধীরা কাফের, অন্যান্য কাফেরদের ন্যায় তাদের হুকুম।[2]

শিয়াদের অপর শায়খ মুহাম্মদ শিরাজি দ্বাদশ ইমামিয়া ব্যতীত সকল শিয়া দল-উপদলকে কাফের বলেছেন এবং খ্রিস্টানদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন : দ্বাদশ ইমামিয়া ব্যতীত শিয়াদের সকল গ্রুপ কাফির, তার দলিল 'মুফিদ' ও 'বাহরানি' প্রমুখদের বাণী, যা প্রমাণ করে কোনো এক ইমামকে অস্বীকার করা আল্লাহ তিনজনের একজন বলা সমান ।[3] তাদের দৃষ্টিতে অন্যান্য মুসলিমরা কাফির।[4] তাই হাসান নাসরুল্লাহ বলেছে: "ওহাবি আন্দোলনকে আমরা কখনো ইসলামি আন্দোলন কিংবা ইসলামের পুনঃজাগরণ মনে করি না"।[5]

---

[1] দেখুন: حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبدالله شبر (২/১৮৯)

[2] দেখুন: الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب (পৃ.৮৫)

[3] দেখুন: মাওসুয়াতুল ফিকহ, লি মুহাম্মদ শিরাজি: (৪/২৬৯)

[4] দেখুন: ইউসুফ বাহরানি রচিত: 'শিহাবুস সাকিব ফি বায়ানি মা'নান নাসিব।

[5] দেখুন: «الأمان» পত্রিকা: সংখ্যা (১৪৯), তারিখ: ৩১/০০/১৯৯৫ই. এভাবে সে বিভিন্ন বক্তৃতায় সকল মুসলিমকে কাফির বলে, যার একটা নমুনা এখানে পেশ করেছি।

শিয়ারা ‘তাকইয়া’ আকিদায় বিশ্বাসী।[1] তারা আরো বিশ্বাস করে যে, পুনর্জন্ম সত্য, অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে মৃতরা দুনিয়ায় ফিরে আসে।[2]

হিযবুল্লাহ একটি শিয়া সংগঠন, যার একমাত্র লক্ষ্য খোমেনি বিপ্লব ও তার দর্শন ‘বিলায়াতুল ফকিহ’-কে সম্প্রসারিত করা। মুসলিম বিশ্বে এ থিউরি প্রচার করাই তার একমাত্র পণ। তাই সে রসালো বক্তব্য ও চাকচিক্যপূর্ণ বাণী দ্বারা সরলমনা মুসলিমদের শিকার করে।

‘বিলায়াতুল ফকিহ’ কি?

‘বিলায়াতুল ফকিহ’ শিয়াদের একটি ধর্মীয় আকিদা ও রাজনৈতিক বিদ‘আত, যার প্রবক্তা খোমেনি। এ আকিদার অর্থ হচ্ছে নেতৃত্ব ও সরকার প্রধান হওয়ার বেশী হকদার ধর্মীয় ফকিহ বা বিদ্যান, যার মধ্যে নির্দিষ্ট কতক শর্ত রয়েছে। তিনি অদৃশ্য নিষ্পাপ ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে উম্মতের নেতৃত্ব দিবেন। তাই উম্মত যাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, সেই ধর্মীয় নেতার পরামর্শ ব্যতীত কোনো নির্দেশ ও কোনো অনুমোদন দেওয়া যাবে না, এভাবে কাঙ্ক্ষিত ইমাম মাহদির প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে।

---

[1] দেখুন: «الأدلة الجلية على جواز التقية» জাওয়াদ কাজবিনী রচিত।

[2] দেখুন: হুর আমেলি রচিত: «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» (পৃ.৬৪)

‘বিলায়াতুল ফকিহ’ প্রবক্তা খোমেনির ছায়ায় হিযবুল্লাহর জন্ম হয় । আমরা পূর্বে বলেছি, সামনেও আসছে যে, হিযবুল্লাহ নিজে বলেছে: ‘হিযবুল্লাহর রক্ত-মাংস ইরানি। হিযবুল্লাহ ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইরানি বিপ্লবের পুরোধা ইমাম খোমেনির অনুসারী। তারপর তার উত্তরসূরি আলি খামেনির অনুসারী।

এখানে আমরা খোমেনি রচিত ‘আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া’ কিতাব থেকে ‘বিলায়াতুল ফকিহ’র ব্যাখ্যা দিচ্ছি:

১. খোমেনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ উম্মতের জন্য দলিল ছিলেন, বর্তমান যুগের ফকিহগণও উম্মতের জন্য দলিল। তাদের আনুগত্য ত্যাগকারীকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন।[1]

২. আল্লাহ তা ‘আলা রাসূলকে মুমিনদের অলি বা অভিভাবক বানিয়েছেন, তার পশ্চাতে ইমাম হচ্ছেন অলি। রাসূল ও ইমামের অলি হওয়ার অর্থ শরয়ী ক্ষেত্রে তাদের নির্দেশ সবার জন্য অপরিহার্য। সেই একই বেলায়াত বা অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব ফকিহের জন্যও স্বীকৃত; তবে ফকিহ ও অলির মাঝে শুধু একটি পার্থক্য রয়েছে।[2] অর্থাৎ ‘ফকিহ’র বিলায়াত অপর ফকিহর উপর

---

[1] ‘আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ’: (১০৯)

[2] এ পার্থক্যের কোনো মানে নেই, প্রকৃতপক্ষে ফকিহর বিলায়াত দ্বারা নিষ্পাপ ইমামদের রাজত্বকে টিকিয়ে রাখা ও দীনের নামে মানুষের উপর কর্তৃত্ব

প্রযোজ্য নয়, এক ফকিহ অপর ফকিহকে পদে বসাতে কিংবা পদ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।[1] কারণ যোগ্যতার বিচারে উভয়ে সবাই সমান।[2]

৩. যদি জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ কোনো ফকিহ হুকুমত কায়েম করার রূপরেখা নিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেও সমাজের সে পরিমাণ কর্তৃত্বের অধিকারী, যে পরিমাণ অধিকারী তাদের নবী, এবং প্রত্যেক মানুষের উপর ওয়াজিব তার কথা শ্রবণ করা ও তার অনুসরণ করা।[3]

শিয়াদের কেন্দ্রীয় নেতা আয়াতুল্লাহ উজমা সায়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ বলেন: “ফকিহর সিদ্ধান্ত কোনো বিষয়কে বৈধতার হুকুম প্রদান করে, কারণ সে ইমামের স্থলাভিষিক্ত, ইমাম হলেন নবীর স্থলাভিষিক্ত, অতএব নবী যেরূপ মুমিনদের নিকট

করাই উদ্দেশ্য।

[1] খোমেনি যদি এ দাবিতে সত্যবাদী হয়, তাহলে কেন সে ফকিহ আয়াতুল্লাহ উজমা শরীয়তমাদারিকে বরখাস্ত করেছে এবং তার ধর্মীয় উপাধি ও পদ ছিনিয়ে নিয়েছে? খোমেনি কেন স্বীয় প্রতিনিধি আয়াতুল্লাহ উজমা আলি মুনতাজিরিকে পদচ্যুত করেছে? তারা কেন খোমেনির ক্ষমতার বলি হল? এর মূল কারণ, তারা ফকিহর বিলায়াতে প্রশ্ন করেছিল এবং তার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছিল?!

[2] ‘আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ’: (পৃ.৭৩-৭৪)

[3] ‘আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ’: (পৃ.৭২)

তাদের নিজেদের থেকেও অতি ঘনিষ্ঠ, ইমামগণও সেরূপ ঘনিষ্ঠ, অনুরূপ ঘনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ ফকিহ”।[1] অতএব “প্রত্যেক বস্তুর বৈধতা যেরূপ নবীদের থেকে আসে, তেমনি আসে ফকিহদের থেকেও।[2]”

হিযবুল্লাহর স্বার্থ কোথায় ও তার অর্থেরযোগানদাতা কে?

হিযবুল্লাহর সমুদয় অর্থের যোগান দেয় ইরান।[3] বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৯০ই. সালে হিযবুল্লাহকে দেওয়া ইরানের অনুদানের পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ১৯৯১ই. সালে তার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এবং ১৯৯২ই. সালে এক শত বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও

---

[1] ‘বিলায়াতুল ফকিহ, লি মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ: পৃ.৪৬), « حزب الله رؤية مغايرة» কিতাব থেকে সংগৃহীত, (পৃ.৬১)

[2] ‘বিলায়াতুল ফকিহ, লি মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ: পৃ.২৪), « حزب الله رؤية مغايرة» কিতাব থেকে সংগৃহীত, (পৃ.৬১)

[33] শুধু এখানেই শেষ নয়, ইরান ইরাকের ‘ফায়লাক বদর’ ও ‘জায়শে মাহদি’কেও অর্থ সাহায্য প্রদান করেন, যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ইরাকে আহলে সুন্নাহ ও তার আলেমদের হত্যা করা এবং তাদের মসজিদগুলো দখল করা।

১৯৯৩ই. সালে ইরান এক শত ষাট মিলিয়ন মার্কিন ডলার হিযবুল্লাহকে অনুদান প্রদান করে।[1]

একাধিক সূত্র থেকে প্রমাণ রাফশানজানির আমলে হিযবুল্লাহকে দেওয়া ইরানি অনুদানের পরিমাণ ছিল ‘দুই শত আশি’ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[2]

এ বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে হিযবুল্লাহ লেবাননে ইরানি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত, তবে লেবাননের জাতীয় উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবদান রাখত না। এসব অনুদানের ফলে হিযবুল্লাহ স্বীয় যোদ্ধাদের পরিসর বৃদ্ধি ও শিয়াদের সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ লাভ করে। হিযবুল্লাহ শিয়াদের প্রয়োজন খরিদ করে দেয় ও তাদের পাশে দাড়ায়, ফলে তারাও তার পক্ষ নেয় ও তার পাশে দাড়ায়। এভাবে সে একটি সমাজের নিকট ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করে। একজন হিযবুল্লাহ যোদ্ধাকে ‘পাঁচ

---

[1] দেখুন: জায়ন মাহমুদের প্রবন্ধ: ‘হিযবুল্লাহ ভেতর থেকে রহস্য ও গোপনীয়তা ঘেড়া’, যা প্রকাশ করেছে «الشراع» পত্রিকা, ১৪/৮/১৯৯৫ই. আরো দেখুন: ড. অলিদ আব্দুন নাসির রচিত ‘ইরানি বিপ্লব ও রাষ্ট্রের উপর গবেষণা’, যা তিনি আব্দুল মুনয়িম রচিত «حزب الله رؤية مغايرة» (পৃ.১৬২) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

[2] দেখুন: মাজাল্লাতুল মাজাল্লাহ, সংখ্যা: ১০১৩, তারিখ: ১১/৭/১৯৯৯ই.। আব্দুল মুনয়িম রচিত: «حزب الله رؤية مغايرة» গ্রন্থ থেকে নেওয়া (পৃ.১৬২)।

হাজার’ লেবাননি লিরা মাসিক বেতন দেওয়া হত।[1] ১৯৮৬ই. সালে একজন লেবাননি যোদ্ধার এটাই সর্বোচ্চ বেতন ছিল। তাই অর্থের লোভে ‘আমাল’ সংগঠনের যোদ্ধারা হিযবুল্লাহতে যোগ দেয় ও তার কাতারে শামিল হয়।[2]

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ইরান হিযবুল্লাহর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল: “সর্বশেষ ইসরাইলি হামলায় লেবাননের যে ক্ষয়ক্ষতি হবে, ইরান তার ক্ষতিপূরণ করবে, ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য জিনিস পত্র তৈরি করে দিবে।

যেরূপ কথা সেরূপ কাজ, প্রথম দিন থেকে শিয়া অঞ্চলসমূহে হিযবুল্লাহ ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়া শুরু করে, যেমন বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চল ও অন্যান্য শিয়া এলাকা। প্রথম কিস্তি হিসেবে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্তকে ঘর ভাড়া ও আসবাব পত্র খরিদ করার অর্থ দেওয়া হয়, যতক্ষণ না ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরগুলো ঠিক হবে, তাদেরকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[3]

---

[1] এ সময় বিশ্ব বাজারে লেবাননি মুদ্রার অনেক মূল্য ছিল।

[2] দেখুন: ‘লেবাননের গোপন যুদ্ধ’ (পৃ.২৭১), আরো দেখুন: ‘হিযবুল্লাহর সাম্রাজ্য’: (পৃ.১৩৫-১৩৬)

[3] লন্ডনস্থ ‘আল-হায়াত’ পত্রিকায় প্রকাশ, প্রাথমিক সাহায্য হিসেবে বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্তদের ১২-হাজার ডলার প্রদান করা হয়, ঘর নির্মাণের জন্য আরো প্রদান করা হবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়’। তারিখ: ১৯/৮/২০০৬ই.

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে হিযবুল্লাহর ব্যাপ্তি

উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশ এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিন্ন আকিদা, অভিন্ন লক্ষ্য ও অভিন্ন পদ্ধতিতে হিযবুল্লাহ সক্রিয় রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি দেশে তার তৎপরতা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি:

বাহরাইনি হিযবুল্লাহ

ইরানে শিয়া বিপ্লব সফল হওয়ার পর তার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশে একাধিক সংগঠন তৈরি করা হয়, যেন বিভিন্ন দেশে ইরানি বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তার ধারাবাহিকতায় বাহরাইনকে মুক্ত (!)[1] করার জন্য ‘হাদি মুদাররিসি’র অধীন الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين “বাহরাইন মুক্তকারী ইসলামিক ফ্রন্ট” নামে এটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার প্রধান কার্যালয় ছিল তেহরানে। প্রতিষ্ঠার শুরুতেই তার নিম্নরূপ উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশ করা হয়:

১. আলে-খলিফার শাসন নিঃশেষ করা।

২. খোমেনি বিপ্লবের ন্যায় বাহরাইনে শিয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

---

[1] মুক্ত তারা কাদের থেকে করবে? তারা চায় সুন্নীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে শিয়াদের কবলে নিয়ে যাওয়া এবং ইরানকেন্দ্রিক এক বৃহৎ শিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। [সম্পাদক]

৩. “উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ”[1] থেকে বাহরাইনকে পৃথক করে ইরানি প্রজাতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা।[2]

‘আল-জাবহাতুল ইসলামিয়াহ’ বা ইসলামিক ফ্রন্ট ইরান থেকে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করে, যেমন «الشعب الثائر» ‘বিপ্লবী জাতি’ ও «الثورة الرسالة» ‘বিপ্লবী পয়গাম’ ইত্যাদি শিরোনামে। এ ফ্রন্টের প্রচার বিভাগের দায়িত্বে ছিল ঈসা মারহুন।

এ ফ্রন্টের অর্থ যোগানদাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল « الصندوق الحسيني الاجتماعي» ‘হুসাইনি সোশ্যাল ফান্ড’। ১৯৭৯ই. সালে ‘বাহরাইন মুক্তকারী ইসলামিক ফ্রন্টে’র শিয়ারা সৌদি আরবের শিয়াদের সাথে মিলে ‘কাতিফে’ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তাদেরকে যখন দমন করা হয়, তখন বাহরাইন গোয়েন্দা সংস্থার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ফ্রন্টের লোকেরা

---

[1] ‘উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ’ এর আরবি নাম مجلس التعاون الخليجي ইংরেজি নাম ‘Gulf Cooperation Council’

[2] দেখুন: ফালাহ আল-মুদাইরিস রচিত: الحركات والجماعات السياسية في البحرين (পৃ.৯৯-১০৪) আল-আহযাব ওয়াল হারাকাত ওয়াল জামা‘আতিল ইসলামিয়্যাহ, ২/৫৩৯; তাতে উল্লেখ আছে যে, জাবহাতুল ইসলামিয়্যাহ লি তাহরিরে বাহরাইনের এ সময়ের বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে: আলে খলীফার শাসন অবসান। তাছাড়া তারা তাদের ‘আস-সাওরাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল বাহরাইন’ এর সপ্তম প্রকাশিত পত্রে সেটা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে।

অপহরণ করে, ফলে সরকার তাদের উপর কঠোর হয় ও তাদের একাধিক নেতাকে বন্দি করে।

চাপের মুখে তারা সাময়িকভাবে ফ্রন্টের কার্যক্রম বন্ধ করে আগামী আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়, বাহরাইনে অস্ত্র সমাগম করতে থাকে, অতঃপর **১৯৮১**ই. সালে মুহাম্মদ তাকি মুদাররিসির নেতৃত্বে তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। তাদের বিদ্রোহ অকৃতকার্য হয়, সরকার তাদের সাথে জড়িত ৭৩-অপরাধীকে আটক করে।

আশির দশকের মাঝামাঝিতে উক্ত ফ্রন্টের সদস্যরা ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার কর্তা ব্যক্তিদের সাথে বৈঠক করে 'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' নামে একটি সামরিক শাখা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'বাহরাইন মুক্তকারী! ইসলামিক ফ্রন্টে'র সাধারণ সম্পাদক শায়খ মুহাম্মদ আলি মাহফুজকে 'হিযবুল্লাহ বাহরাইনি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি তিন হাজার বাহরা ইনি শিয়া যুবকদের সমন্বয়ে 'হিযবুল্লাহ বাহরা ইন' গঠন করেন এবং তাদেরকে ইরান ও লেবাননে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। হিযবুল্লাহ বাহরাইনির প্রধান নির্বাচিত হন আব্দুল আমির জামরি, বর্তমান তার স্থানে আছেন আলি সালমান।

'বাহরাইন মুক্তকারী ইসলামিক ফ্রন্টে'র প্রধান হাদি মুদাররিসিকে হিযবুল্লাহ বাহরাইনির অভিভাবক ও অর্থ যোগানদাতা গণ্য করা

হয়। অনুরূপ মুহাম্মদ তাকি মুদাররিসিও তার একজন অর্থ যোগানদাতা ও তাত্ত্বিক অভিভাবক।

‘হিযবুল্লাহ বাহরাইনি’ ত্রাস ও বিপ্লব সৃষ্টি করে বাহরাইনের গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত স্থানসমূহে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। তার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান সরকারকে হটিয়ে ইরানি শিয়া সরকারের আদলে ও তার আদর্শের উপর নতুন সরকার গঠন করা। এ কথার প্রথম প্রমাণ আয়াতুল্লাহ রুহানির ঘোষণা, তিনি বলেছেন: নিশ্চয় বাহরাইন ইরানের অনুগত ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি অংশ।[1]

১৯৯৪ই. সালের বিদ্রোহ, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারা বিভিন্ন নামে অপরাধ সংগঠিত করত, যেমন منظمة العمل المباشر ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, حركة أحرار البحرين ‘বাহরাইন স্বাধীনতাকামী আন্দোলন’ ও منظمة الوطن السليب ‘অধিকৃত মাতৃভূমি [রক্ষার] আন্দোলন’ ইত্যাদি, সবগুলো আন্দোলনের গোঁড়ায় ছিল ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’।

পরবর্তীতে এসব দল আলি সালমানের নেতৃত্বে جمعية الوفاق الوطني الإسلامية বা ‘জাতীয়তাবাদী ইসলামি সম্মিলিত জোটে’র অন্তর্ভুক্ত

---

[1] দেখুন: الحركات والجماعات السياسية في البحرين (পৃ.৯৯-১০০)

হয়। তারা নিজেদেরকে শিয়া মতবাদ প্রচার ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত করে। সামরিক শাখা ও বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় 'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' এর হাতে।

'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' এর অপর নাম « حركة أحرار البحرين » এর হেড কোয়ার্টার লন্ডন থেকে « صوت البحرين » 'বাহরাইন কণ্ঠ' নামে মাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। এ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে হিযবুল্লাহ বাহরাইন তাদের দাবিসমূহ, তৎপরতা ও খবরাখবর প্রচার করে। সংগঠনটি এমন অনেক বিদেশী দেশ থেকে অনুদান হাসিল করে, ইসলামের প্রতি যাদের রয়েছে প্রচুর বিদ্বেষ। এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় 'লন্ডন ফোরাম' [পূর্বনাম 'মিম্বারুল বাহারিনাহ'] এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তার এক অনুদানের পরিমাণ ছিল ৮০ হাজার ডলার থেকেও অধিক। 'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' তাদের 'বাহরাইন স্বাধীনতাকামী আন্দোলন' এর নামে এমনসব রাজনৈতিক সংস্কার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে, যাতে করে তার সামরিক শাখার সদস্যরা সরকার পরিবর্তের ন্যায় অভীষ্ট লক্ষ্য আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়।

'বাহরাইন স্বাধীনতাকামী আন্দোলনে'র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ হলেন সায়িদ শিহাবী, মাজিদ আলাবি ও মানসুর জামরি।

১৯৯৬ই. সালে বাহরাইন পুনরায় হত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞের সম্মুখীন হয়, ইরান যার পরিকল্পনা করেছিল।

১৪-মার্চ ১৯৯৬ই. সালে 'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' সাতরাহ ওয়াদিয়ান নামক স্থানে এক হোটেলে অগ্নিসংযোগ করে, যার ফলে এশিয়ার সাতজন লোক মারা যায়, এটাও তাদের হিংসার নগ্ন প্রকাশ।

তারপর ২১মার্চ ১৯৯৬ই. সালে 'আজ-জিয়ানি' গ্যারেজে আগুন লাগিয়ে দেয়, ফলে শো- রুমে বিদ্যমান সকল গাড়ি পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়।

তাদের হিংসা ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়, যার ফলে তারা ৬-মার্চ ১৯৯৬ই. সালে বড় বড় নয়টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে ধ্বংস্তুপে পরিণত করে।

এ ছাড়া তারা একাধিক হোটেল ও স্কুল জ্বালিয়ে দেয়, অনুরূপ জ্বালিয়ে দেয় সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, টেলিফোন সংস্থা, যা রাস্তার পাশে অবস্থিত ছিল। অনুরূপ তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে বাহরাইনের ইসলামি ব্যাংক, বাহরাইনের জাতীয় ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র, যা বাহরাইনের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

বছরের শুরু থেকে ইরানি প্রচার মাধ্যমগুলো বাহরাইনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য জনগণকে উসকে দেয়। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যেন তারা জাতীয় কর্মকাণ্ডে বাঁধার সৃষ্টি করে ও অফিস আদালতে ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে।

১৯৯৬ই. সালের ১৩ -ফেব্রুয়ারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি দু'দিনের ধর্মঘট ডাক দেওয়া হয়। শিয়াদের নিয়ন্ত্রিত প্রচার যন্ত্রগুলো সাধারণ মানুষকে আগামী ঈদুল ফিতরে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়!

অনুরূপ ২-মে ১৯৯৬ই. সালে বাহরাইন জনগণকে সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আগত ঈদুল আদহা বয়কট করার আহ্বান জানায়।[1]

ইরানি সংবাদ পত্রগুলো শিয়া সম্প্রদায়কে বিভিন্নভাবে উসকে দেয়। ১৯৯৬ই. সালের ২২-মার্চ ইরানি পত্রিকার এক সংবাদে বলা হয়: “নিশ্চয় বাহরাইনি সরকার বাহরাইনি জনগণের সামনে দাড়াতে সক্ষম হবে না” | এ জাতীয় সংবাদ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য শিয়াদের দাবি বাস্তবায়ন করা ও বাহরাইনকে আরেকটি শিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করা।

«الأنباء الكويتية» ম্যাগাজিন ১০-মে ১৯৯৬ই. তারিখে প্রকাশ করে যে, ইরাকি সেনাবাহিনী যেসব অস্ত্র কুয়েতে রেখে গেছে, সেগুলো ‘কুয়েতি হিযবুল্লাহ দল’ ক্রয় ও কব্জা করে বাহরাইনি হিযবুল্লাহর নিকট চালান করেছে।

---

[1] অথচ তারা ঈদে গাদির, ঈদে নওরোজ ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের দিন (যাকে তারা ‘ফারহুয যাহরা’ নাম দিয়ে থাকে সেদিন) ঈদ উদযাপন থেকে বিরত থাকে না, কিংবা তা বয়কটের আহ্বান জানায় না।

পত্রিকাটি আরো প্রকাশ করেছে যে, 'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' এর প্রতি ইরানের যেসব নির্দেশ রয়েছে, তন্মধ্যে বাহরাইনে গোপন পথে অস্ত্র প্রেরণ করার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অন্যতম। অস্ত্র আমদানির পদক্ষেপ খুব গোপনে গ্রহণ করা হয়, যেন বাহরাইনের নিরাপত্তা বাহিনী তার সন্ধান না পায় এবং নিরাপদভাবে বিভিন্ন স্থানে বণ্টন করা সম্ভব হয়।

'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' এর একজন কেন্দ্রীয় নেতা আলি আহমদ কাজেম মুতাকাওয়ি স্বীকার করেন: ইরানি গোয়েন্দা বিভাগের এক দায়িত্বশীল আহমদ শারিফির সাথে আমরা এক বৈঠকে বসেছি, তাতে তিনি সমুদ্রপথে বাহরাইনে অস্ত্র সরবরাহের পরামর্শ দিয়েছেন।

এ ঘোষণার সপক্ষে জাসেম হাসান খাইয়াত বলেন: ইরানি গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা আহমদ শারিফির সাথে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, যে কোনো উপায়ে হোক বাহরাইনে অস্ত্র চালান করতে হবে।

জাসেম খাইয়াত আরো বলেন: মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে সরকার পরিবর্তন করা ও ইরানের আদলে বাহরাইনে একটি শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা। তিনি আরো বলেন, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামরিক প্রশিক্ষণ হাসিলের জন্য ইরানি গোয়েন্দা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ রেজা আলে-

সাদেক ও মেজর ওহিদির মাধ্যমে প্রথম ব্যাচ উত্তর তেহরানের ‘কারাজ’ ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়েছে।

শিয়া খতিব আব্বাস আলি আহমদ হাবিল জনগণকে নানা খুতবা ও বক্তৃতার মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে উসকে দেয়। সে মানুষকে কঠোর হতে ও সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ছোট ছোট অনেক জমাত তৈরি করে, যেন পর্যায়ক্রমে তারা ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ দলে যোগ দেয়।[1]

শিয়া আব্দুল ওয়াহহাব হুসাইনও এ সংগঠনে অনেক অবদান রাখে। কিভাবে নিরাপত্তা বাহিনী ও তদন্তকারীদের সাথে আচরণ করতে হবে, কিভাবে বিব্রতকর প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে হবে, কিভাবে সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে হবে, কিভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামাজিক বয়কট ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে সে ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’কে দিকনির্দেশনা প্রদান করত। ‘খতিব আব্বাস হাবিল’ আব্দুল ওয়াহহাব ও আব্দুল আমির জামরি থেকে মুহাম্মদ রিয়াশের মাধ্যমে উপরোক্ত আবদুল ওয়াহাব হুসাইন থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করত।

তখনকার বাহরাইনের তথ্যমন্ত্রণালয় ও মন্ত্রীপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন: “‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ ইরানের বিপ্লবী গার্ডের একটি

---

[1] দেখুন বাহরাইনের টেলিভিষণে দেওয়া তাদের ভাষণ ও তখনকার আরবি ও বাহরানি পত্রিকাসমূহ।

ক্যাম্প উত্তর তেহরানের ‘কারাজ’ ক্যাম্পে একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছে”। পরবর্তীতে যখন ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এর কর্মকাণ্ডের সাথে ইরানের সম্পৃক্ততা প্রকাশ পেল, ইরান চাপের মাথায় ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এর ব্যাচগুলোকে হিযবুল্লাহ লেবাননের ক্যাম্পে স্থানান্তর করে।

‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এসব ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যেমন অস্ত্র, বোমা, আত্মরক্ষার কৌশল, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ও প্রতারণার শিল্প ইত্যাদি।[1]

১৯৯৬ই. সালের ঘটনার সাথে জড়িত হিযবুল্লাহর কতক ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ: ক. আলি আহমদ কাজেম মুতকাওয়ি, ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এর ফাইন্যান্স কিমিটির সদস্য ও ইরানি গোয়েন্দা বিভাগের সাথে সমন্বয়কারী। খ. আদেল শালাহ, সামরিক শাখার সদস্য। গ. খলিল সুলতান, প্রচার সম্পাদক। ঘ. জাসেম হাসান মানসুর আল-খাইয়াত, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির সদস্য। ঙ. কুয়েত প্রবাসী শায়খ মুহাম্মদ হাবিব, হুসাইন আহমদ মুদাইফি, হুসাইন ইউসুফ আলি, খলিল ইবরাহিম ঈসা আল-হায়েকি।[2]

---

[1] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আলে-খলিফা ও তখনকার বাহরানি পত্র-পত্রিকা এ সংবাদ প্রকাশ করেন।

[22] ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এর সাথে সম্পৃক্ত তখন ৪৪-জন অপরাধীকে গ্রেফতার

তাদের সন্ত্রাস ও বিদ্রোহের ফলে সে বছর বাহরাইনের ক্ষতির পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৬৫৮,২২৪,১৫ ডলার।

এ সব ঘটনার পর, বাহরাইন সরকার কর্তৃক শিয়াদের প্রতি প্রচুর ছাড় দেওয়া এবং শিয়া হুসাইনি ডেরাসমূহের খতিব, কালো পাগড়িধারী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও 'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' এর কর্মকর্তা যেমন শিয়া আলি সুলাইমান, আব্দুল আমির জামরি ও মুহাম্মদ সনদ প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রতি বাহরাইন সরকারের ক্ষমাসূলভ আচরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা দেওয়া সত্বেও তারা এখনও তাদের নিজেদেরকে বিভিন্ন প্রকার ধ্বংসযজ্ঞ ও সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছে। তাদের সর্বশেষ জঘন্য ঘটনা ২০০৬ই. সালে বাহরাইনের সরকারের নিকট প্রকাশ পায়, যা ছিল একটি ইরানি ষড়যন্ত্রের নীলনকশা, যেমন বাহরাইনের বিভিন্ন জায়গায় শিয়াদের নামে জমি ক্রয় করে সেখানে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা , 'হিযবুল্লাহ বাহরাইন' এর সদস্যদেরকে বাহরাইনের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাকে সহযোগিতা করা, যাদের সম্পর্ক ইরানের সাথে রয়েছে।[1]

করা হয়।

[1] দেখুন: ৩/৯/২০০৬ই. তারিখের موقع إيلاف ও ৪/৯/২০০৬ই. তারিখের صحيفة الأيام البحرينية

বাহরাইনের নিরাপত্তা বাহিনীর রিপোর্টে প্রকাশ যে, হিযবুল্লাহ বাহরাইনকে পুনরায় সংগঠিত ও নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে এবং তার সদস্যদেরকে তেহরানের নিকটবর্তী “ইমাম আলি ব্যারাকে” একাধিক ব্যাচে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এর একাধিক প্রতিনিধি ‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ এর একাধিক শীর্ষ নেতার সাথে বৈঠকে বসেন, যেমন ‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ এর ইকরাম বারাকাত ও ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন ’ এর সামরিক শাখার নেতৃবর্গ । তাদের বৈঠক প্রথমে দামেস্ক ও পরবর্তীতে বৈরুতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিয়াদের আন্দোলন ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়, যেমন কিভাবে শিয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে ও ইরানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ইত্যাদি। এতে ‘হাসান নাসরুল্লাহ’ বাহরাইনি শিয়া যোদ্ধাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।[1]

তাদের স্বীকারোক্তি থেকে প্রমাণিত যে, তাদের আলোচনার কতক বিষয় ছিল বাহরাইনি শিয়াদের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা, উভয় পক্ষের সাহায্য ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাহরাইনের অর্থনীতিতে শিয়া ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, মৌলিক

---

[1] দেখুন: مجلة الوطن العربي সংখ্যা ১৫৪৩, তারিখ: ২৭/৯/২০০৬ই.

কতিপয় পণ্যের উপর তাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করা, যেন চাপ প্রয়োগ করে সরকার থেকে স্বার্থ আদায় করা সম্ভব হয়।

অনুরূপ ইরানি গোয়েন্দা বিভাগ বাহরাইনের সংসদ নির্বাচনে শিয়াদের ইতিবাচক অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে ও তাদেরকে সমর্থন জানায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের জন্য শিয়াদের সর্বাত্মক সাহায্য করে, যেন তারা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন পাসে সক্ষম হয় । ইরান এভাবেই তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে, কারণ তারা সবাই উপসাগর ও আরব ভূমিতে ইরানের স্বার্থ ও তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অব্যাহত চেষ্টা করে যাচ্ছে।[1]

---

[1] দেখুন: مجلة الوطن العربي সংখ্যা ১৫৪৩, তারিখ: ২৭/৯/২০০৬ই.

হিজাযী হিযবুল্লাহ (মক্কা-মদীনায় হিযবুল্লাহ্)

১৯৭৯ই. সালে ইরানে খোমেনি বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইরানি সরকার সৌদি আরবে তার অনুসারীদের সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে, যার সূত্র ধরে ১৪০০হি. কাতিফে শিয়া বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার শ্লোগান ছিল:

«مبدؤنا حسيني، قائدنا خميني» «يسقط النظام السعودي» «يسقط فهد وخالد».

১. ‘আমাদের আদর্শ হুসাইনি, আমাদের নেতা খোমেনি’। ২. ‘সৌদি সরকারের পতন ঘটবে’। ৩. ‘পতন ঘটবে ফাহাদ ও খালেদের’, ইত্যাদি।

ইরানে খোমেনি বিপ্লবের পর ইরান-সৌদি আরবের শিয়াদের মাঝে যখন গভীর সম্পর্ক কায়েম হয়, তখন ইরানের পক্ষ থেকে হাসান সাফফারের নেতৃত্বে সৌদি আরবে একটি শিয়া সংগঠন তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যার নাম হবে: منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية ‘জাজিরাতুল আরবের স্বাধীনতাকামী ইসলামি বিপ্লবী সংগঠন’।[1] পরবর্তীতে তার নাম নির্ধারণ করা হয়: منظّمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية ‘জাজিরাতুল আরব ভিত্তিক ইসলামি বিপ্লবী সংগঠন’। এ সংগঠনের লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ:

---

[1] দেখুন: الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية (পৃ.২/৫৮১)

১. ইরানি বিপ্লবকে রক্ষা করা এবং ইসলামি বিশ্বে তা রপ্তানি করণের কাজ সুগম করা।

২. ইসলামি সুন্নি সরকার থেকে জাজিরাতুল আরব-সৌদিকে মুক্ত করা এবং তাতে ইরানের আদলে শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা।

অতএব তাদের দৃষ্টিতে সৌদি সরকার ও উপসাগরীয় অন্যান্য সরকারগুলো তাগুতি কুফরি। এ সংগঠন নিজেকে খোমেনি বিপ্লবের একটি অংশ জ্ঞান করে। সংগঠনের মুরব্বি ও অভিভাবক শায়খ হাসান সাফফার বলেন: "আমরা ইরান থেকে দিক-নির্দেশনার মত অনেক কিছু প্রত্যাশা ও দাবি করি, যা ইসলামি বিপ্লব জন্ম দিতে সক্ষম"।[1]

এ সংগঠন মনে করে, ইসলামি বিপ্লব বাস্তবায়ন করার জন্য তিনটি শর্ত পুরো করা জরুরি:

১. নেতৃবৃন্দের হিজরত করা ও বহির্বিশ্ব থেকে তার দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া, কারণ প্রবাসে বসে অধিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায়। এ ছাড়া একাধিক অনারব সংগঠন ও সংস্থার প্রয়োজন, যারা অত্র সংস্থাকে বৈষয়িক ও তাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ করবে।

২. অস্ত্র ব্যতীত শিয়া বিপ্লবে সফলতা আসবে না।

৩. এ সংগঠনের সহযোগী একাধিক সংগঠন তৈরি করা জরুরি।

---

[1] দেখুন: الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية (পৃ.২/৫৮৮)

‘জাজিরাতুল আরব ভিত্তিক ইসলামি বিপ্লবী সংগঠনে’র প্রথম কার্যালয় ছিল ইরানে, তারপর দামেস্কে এবং সর্বশেষ লন্ডনে স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় ।এ সংগঠন থেকে ১৯৮০ই. দশকে «الثورة الإسلامية» ‘ইসলামি বিপ্লব’ নামে একটি পত্রিকা বের করা হয়।

সংগঠন ও তার থেকে প্রকাশিত পত্রিকার স্পর্শকাতর নাম থেকে তাদের অভিজ্ঞতা হল, এ নাম তাদের স্বার্থের উপযোগী নয়, এভাবে জনগণের মাঝে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে না। অতএব কৌশলগত কারণে ১৯৯০ই. সালের শেষে ও ১৯৯১ই. সালের প্রথম দিকে « منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية » নাম পরিবর্তন করে « الحركة الإصلاحية [الشيعية] في الجزيرة العربية » ‘জাজিরাতুল আরব ভিত্তিক [শিয়া] সংস্কার আন্দোলন’ রাখা হয়। আর « الثورة الإسلامية » ম্যাগাজিনের নাম পরিবর্তন করে « مجلة الجزيرة العربية » রাখা হয়।

অনুরূপ এ সংস্থাটি « دار الصفا » ‘দারুস সাফা’ নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান চালু করে তার মাধ্যমে সৌদি সমাজের বিরুদ্ধে অপবাদ ও উসকানি প্রচার করতে থাকে। তার আরেকটি কাজ ছিল সংগঠনের অর্থ সাহায্য সংগ্রহের নিমিত্তে নানা তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট তৈরি করে পশ্চিমা বিশ্ব ও ইয়াহূদী সংস্থাসমূহে সরবরাহ

করা। উল্লেখ্য এ সংস্থার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক সাংসদদের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল।

১৯৯১ই. সাল থেকে **১৯৯৩**ই. সাল পর্যন্ত « مجلة الجزيرة العربية » এর প্রায় ত্রিশটি সংখ্যা বের হয়। এ সময়ে পত্রিকাটি বহির্বিশ্ব থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য লাভ করে, তার উদ্দেশ্য ইসলামি সরকার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা এবং সৌদি আরবে বিশৃঙ্খলা, ফেতনা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করা। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিল হামজাহ হাসান এবং তার নির্বাহী সম্পাদক ছিল আব্দুল আমির মুসা।

তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যেহেতু একাধিক সংস্থা তৈরির পরিকল্পনা ছিল, তাই তারা « منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية » এর অধীন لجنة حقوق الإنسان ‘মানবাধিকার সংস্থা’ তৈরি করে। এ সংস্থাকে তারা নিজেদের থেকে দূরে রাখে, তবে আমেরিকান সরকারের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে বলে, যেন তার সাথে আমেরিকান ও ইয়াহূদী অনেক সংস্থার গভীর সম্পর্ক কায়েম হয়। তাছাড়া তারা এর কিছু শাখা সংগঠনও তৈরী করে। তারা « اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية » ‘উপসাগর ও আরব উপদ্বীপে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা’ নামে সংস্থা তৈরি করে । এ সংস্থা "Arabia moniter" নামে একটি ম্যাগাজিন বের করে ইংরেজি ভাষায়, তার অধিকাংশ প্রবন্ধ

ছিল বাড়াবাড়ি, অপবাদ ও মিথ্যায় ভরপুর, বিপ্লবী আন্দোলন ও তার চিন্তাধারা তো তাতে ছিলই।

এ সংগঠনের ওয়াশিংটন অফিসের কর্মকর্তা ছিল জাফর শায়েব, লন্ডন অফিসের কর্মকর্তা ছিল বু খামিস, আর সাদেক জাবরান কেন্দ্রীয় অফিসে তাদের সহযোগী ছিল। এ সংগঠনের অপর সক্রিয় কর্মী হচ্ছে তাওফিক সাইফ, যে ইতোপূর্বে الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিল।

‘জাজিরাতুল আরব ভিত্তিক [শিয়া] সংস্কার আন্দোলনে’র সক্রিয় কতক কর্মকর্তা [যারা ইতঃপূর্বে ‘জাজিরাতুল আরব ভিত্তিক ইসলামি বিপ্লবী সংগঠনে’ কর্মরত ছিল] নিম্নরূপ:

১. হাসান আস-সাফফার, প্রতিষ্ঠাতা, পরামর্শদাতা ও অভিভাবক।

২. তাওফিক সাইফ, সাধারণ সম্পাদক।

৩. হামজা আল হাসান, «الجزيرة العربية» ম্যাগাজিনের চীফ এডিটর।

৪. মির্জা খুওয়াইলিদি, প্রকাশনা বিভাগের ম্যানেজার।

এ ছাড়াও আছেন আদেল সুলাইমান, হাবিব ইবরাহিম, ফুওয়াদ ইবরাহিম, মুহাম্মদ হুসাইন, যাকি মিলাদি, ঈসা মায‘আল, জাফর শায়েব, সাদেক জাবরান ও ফাউজি প্রমুখগণ।

১৯৯৩ই. ও ১৯৯৪ই. সালে ‘জাজিরাতুল আরব ভিত্তিক [শিয়া] সংস্কার আন্দোলন’ ও সৌদি সরকার এক চুক্তি স্বাক্ষর করে,

যাতে উভয়ে এ বিষয়ে একমত হয় যে, বহির্বিশ্বে শিয়া সংস্থার সকল অফিস বন্ধ করা হবে, সেখান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের প্রকাশনা বন্ধ করা হবে, বহির্বিশ্বে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা হবে, ইয়াহূদী ও অন্যান্য সংস্থার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে এবং সামাজিক ও সরকারী সংস্থার সাথে তারা কাজ করবে।

ইরানি খোমেনি বিপ্লবের হাকিকত যখন প্রকাশ পেল; মানুষ জেনে গেল যে, এটা শুধু সাম্প্রদায়িক বিপ্লব, যার উদ্দেশ্য অত্র অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা; মানুষ আরো জানল যে, তারা দীন ও রাজনৈতিক ব্যাপারে 'তাকইয়া' (প্রকাশ্যে কিছু বলে মানুষকে ধোকা দেওয়া) নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে; তখন এসব বিষয় চিন্তা করে তাদের কেউ দেশের অভ্যন্তরে কাজ করার নিমিত্তে সৌদিতে ফিরে আসে। কেউ দেশের বাইরে থেকে যায়, ভাইদের শুরু করা কাজ সমাপ্ত করা ও তাদের কর্ম অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে।[1]
যদিও চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে, তবুও তাদের অনেকে জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয়নি।

---

[1] তাদের কেউ চুক্তিতে সাক্ষর করে, কেউ ইহুদি ও বেরুনি সংস্থার অর্থ দ্বারা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাইরে থেকে যায়, যেমন আলি আলে-আহমদ। তার লক্ষ্য সৌদি ইসলামি রাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থানকারী প্রত্যেক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

তারা ২০০৬ই. সালের অক্টোবর মাসে সৌদি আরবের কাতিফ জেলায় সর্বশেষ বিদ্রোহ করে । এক শিয়া মাহফিলে হাসান সাফফার ঘোষণা করেন, যদি সৌদি সরকার শিয়াদের দাবি না শুনে, তাহলে শিয়া অঞ্চলে ইরানি বিপ্লব ঘটিয়ে দেব, যেমন ঘটিয়েছিলাম ১৪০০হি. সালে এবং মক্কায় ১৪০৭হি.।

(হিযবুল্লাহ হিজায এর) সামরিক উইং

১৯৮৭ই. সালে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে منظّمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية এর অধীন একটি সামরিক শাখা তৈরি করা হয়, যার নাম দেওয়া হয় حزب الله الحجاز ‘হিজাযী হিযবুল্লাহ’।[1] এ গ্রুপটি ইরানের শিয়া সরকার ও তার সেনা সদস্যের সাথে সমন্বয় করে হজ ও অন্যান্য মৌসুমে সৌদি আরবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

ইরানি প্রজাতন্ত্রের চৌকস সেনাবাহিনীর পরামর্শে এ দলটি গঠন করা হয়। তার নেতৃত্বে ছিল ইরানি গোয়েন্দা কর্মকর্তা আহমদ শারিফি, পরিকল্পনা মোতাবেক কতক সৌদি শিয়াকে ইরানের ‘কুম’ নগরীতে পড়া-শুনার জন্য প্রেরণ করা হয় । সৌদি আরবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে যখন ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ ও ‘জাজিরাতুল

---

[1] হিজাজ নাম করণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের ইমাম খোমেনি সৌদি আরবের ইসলামি সরকারকে স্বীকার করে না, যদিও এ নামকরণ তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়নি, কারণ হিজাজিরা সুন্নী, আর তারা হচ্ছে শিয়া।

আরব ভিত্তিক ইসলামি বিপ্লবী আন্দোলনে’র মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দিল, ইরান আহমদ শারিফির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ এর উপর সামরিক কর্মকাণ্ড ন্যস্ত করে উভয়কে পৃথক করে দেয়।

১৪০৭হি. হজের মৌসুমে ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ ইরানি বিপ্লবী গার্ডের সমন্বয়ে বড় বিক্ষোভের আয়োজন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল হাজিদের হত্যা করা, জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করা এবং মসজিদে হারাম ও অন্যান্য পবিত্র স্থানসমুহে ফেতনার সৃষ্টি করা।[1] অনুরূপ তারা কুয়েতি হিযবুল্লাহর সাথে মিশে মক্কার সুড়ঙ্গ পথে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করেছিল, যে কারণে শত শত হাজি মারা যায় ও আহত হয়।

৯/২/১৪১৭হি. মোতাবেক ২৫/৬/১৯৯৬ই. সালে ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ ‘খুবার’ শহরে এক আবাসিক হোটেলে বিরাট গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। তারা গাড়িটি জনবহুল এলাকায় দাঁড় করিয়ে অপর গাড়ি করে দ্রুত পালিয়ে যায়, যার চার মিনিট পরেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এ কাজে অংশ গ্রহণকারী শিয়া সম্প্রদায়ের কতক ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে: হানি সায়েগ, মোস্তফা কাসসাব, জাফর শাবিখাত, ইবরাহিম ইয়াকুব, আলি হাজুরি, আব্দুল কারিম নাসির,

---

[1] দেখুন: الحرس الثوري الإيراني، كينيث كاتزمان (পৃ.১৯৫)

আহমদ মুগতাসাল, যাকে ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ এর সামরিক কর্মকর্তা ও খুবার শহরে বোমা বিস্ফোরণে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বদানকারী গণ্য করা হয়। আরো কতিপয় যেমন হুসাইন আলে মুগিস, আব্দুর রহমান জারাশ, শায়খ সায়িদ আল-বিহার, শায়খ আব্দুল জলিল সামিন প্রমুখগণ।

খুবার নগরে আবাসিক হোটেলে বোমা বিস্ফোরণের পর কানাডায় হানি সায়েগকে গ্রেফতার করা হয়, অতঃপর আমেরিকার মাধ্যমে তাকে সৌদি হস্তান্তর করে। আর আব্দুল কারিম, আহমদ মাগলাস, ইবরাহিম ইয়াকুব ও আলি হুরি ইরান পলায়ন করে। ‘শাবিখাত’কে সিরিয়ায় আটক করার একদিন পর সেখানকার কোনো এক জেলখানায় আত্মহত্যার নাটক করে তাকে হত্যা করা হয়, অতঃপর তাকে সিরিয়া থেকে ফেরারি ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, ইরানের পরামর্শে গোয়েন্দাদের দ্বারা তাকে হত্যা করা হয়, যেন খুবার আবাসিক হোটেলে বোমা বিস্ফোরণের মূল তথ্য ফাঁস না হয়।

‘হিযবুল্লাহ হিজায’ এর অপর গুরুত্বপূর্ণ নেতা হচ্ছে, আব্দুল কারিম হুসাইন নাসের।

তাছাড়া আরও রয়েছে, ফাদেল আল উলবী, আলী মারহূন, মুস্তফা আল-মু‘আল্লিম, সালেহ রমদান, যাদেরকে বোমা বিস্ফোরণের পূর্বেই এ কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সময় গ্রেফতার করা হয়। ফলে

আহমদ মাগসাল এ বিস্ফোরণের দায়িত্ব অন্য শাখাকে প্রদান করে।

‘হিযবুল্লাহ হিজায’ এর অপর নেতৃবৃন্দ হলেন: শায়খ জাফর আলি মুবারেক, আব্দুল কারিম কাজেম আল-হাবিল ও হাশেম সাখস, তারা সবাই ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ এর পৃষ্ঠপোষক ও তার অর্থ যোগানদাতা।[1]

এ ছাড়া আরো অনেক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, যাদের সমন্বয়ে ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা ইরান ও লেবাননে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সৌদি ইসলামি হুকুমতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যেন সৌদি সরকারকে উৎখাত করে ইরানের আদলে একটি শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভব হয়।[2]

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে ‘হিযবুল্লাহ হিজায’ এর একাধিক সদস্যকে গ্রেফতার হয়, অনেকে « منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية» সংগঠন থেকে অব্যাহতি নেয়, আবার অনেকে প্রবাস

---

[1] এ তিন জনই শিয়াদের নিকট ‘হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন’ খেতাব প্রাপ্ত, যা প্রমাণ করে শিয়াদের নিকট তারা মুজতাহিদের মর্তবায় উপনীত।

[2] দেখুন: جريدة الرياض মঙ্গলবার, ৪ জুল-কাদাহ, ১৪২৬হি. মোতাবেক ৬ ডিসেম্বর ২০০৫ই. সংখ্যা: (১৩৬৭৯), আরো দেখুন: الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية (২/৫৮১-৬০১)

জীবনে গিয়ে রাজনীতি ও শিয়া মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। বর্তমানেও তারা সৌদি সরকার থেকে আরব ভূমিকে মুক্ত করার ষড়যন্ত্র, সরকারের বিরোধিতা করা ও তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত। অনুরূপ বিভিন্ন দেশে রয়েছে তাদের নানা ওয়েব সাইট, যেখানে সৌদি সরকারের কুৎসা রটনা ও ইরানি ইসলামি বিপ্লবের পক্ষে প্রতিনিয়ত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সংবাদ প্রচার করা হয়।[1]

---

[1] দেখুন: بيان حزب الله الحجاز المؤرّخ তারিখ: ৯/৩/২০০৫ই.

কুয়েতি হিযবুল্লাহ

‘হিযবুল্লাহ লেবানন’র পর আশির দশকে হিযবুল্লাহ কুয়েতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুতে সংগঠনটি নতুন নতুন নাম গ্রহণ করে, যেমন: «طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية» ‘প্রজাতন্ত্র কুয়েতি সরকার পরিবর্তনকারী বাহিনী’। কখনো নাম ধারণ করে «صوت الشعب الكويتي الحر» ‘স্বাধীন কুয়েতি জাতির কণ্ঠ’। কখনো নাম ধারণ করে منظمة الجهاد الإسلامي ‘ইসলামি জিহাদের সংগঠন’। কখনো নাম ধারণ করে «قوات المنظمة الثورية في الكويت» ‘কুয়েত ভিত্তিক বিপ্লবী সংস্থার বাহিনী’ সবক’টি সংগঠনের পশ্চাতে রয়েছে ‘হিযবুল্লাহ কুয়েত’।[1]

ইরানের ধর্মীয় মারকাজ ‘কুম’-এ[2] পড়ুয়া ছাত্ররা এসব শাখা-প্রশাখা তৈরি করেছে, যার অধিকাংশ সদস্যের সম্পর্ক প্রজাতন্ত্র ইরানি বিপ্লবী গার্ডের সাথে, তারা সেখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে।[3]

---

[1] দেখুন: ড. ফালাহ মাদিরাস রচিত: الحركة الشيعية في الكويت (পৃ.৩০-৩১)

[2] উপসাগরীয় দেশসমূহে সক্রিয় হিযবুল্লাহর শাখা-প্রশাখার সদস্যদের প্রথম পরিচয় হয় কুম-এ, যেখানে তারা দীনি ইলম অর্জন করার জন্য প্রস্থান করে।

[3] দেখুন: الحركة الشيعية في الكويت ফালাহ মুদাইরিসি, (পৃ.৩১)

তেহরানে অবস্থিত المركز الكويتي للإعلام الإسلامي! في طهران ‘ইসলাম প্রচারের জন্য তেহরানে অবস্থিত কুয়েতি মারকাজ’ থেকে «النصر» নামে একটি ম্যাগাজিন বের হত, যা হিযবুল্লাহ কুয়েতির চিন্তা ও আদর্শের মুখপাত্র ছিল।

ম্যাগাজিনটি কুয়েতি হিযবুল্লাহকে উসকে দেয়, যেন তারা শিয়াদের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও ইরানের আদলে একটি বন্ধু রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করে। ‘হিযবুল্লাহ কুয়েত’ও তাদের প্ররোচনায় দেশের অভ্যন্তরে ফেতনা সৃষ্টি, বোমা বিস্ফোরণ, অপহরণ ও গুমের ন্যায় জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়, দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও ইরানি আদলে আরেকটি শিয়া রাষ্ট্র গঠন করার উদ্দেশ্যে।

“হিযবুল্লাহ কুয়েত’কে ইরানি শিয়া বিপ্লবের একটি অঙ্গ-সংঘটন জ্ঞান করা হয়, যার নেতৃত্বে রয়েছে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী। তারা বিশ্বাস করে, আলে-সাবার কুয়েতের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই”।[1]

---

[1] দেখুন: مجلة السياسة الدولية-الصادرة عن صحيفة الإهرام বর্ষ-৩২, সংখ্যা-১২৩, জানুয়ারী ১৯৯৬ই.

‘হিযবুল্লাহ কুয়েত’ বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড লিপ্ত হয়, যেমন: ২৫-৫-১৯৮৫ই. সালে « حزب الدعوة» ‘হিযবুদ দাওয়াহ’ [1] নামে একটি শিয়া সংগঠন ন্যক্কারজনক যে কাণ্ড করে তারা সেটাকে সমর্থন জানায়। ঘটনাটি ছিল এই যে, যখন আমিরের গাড়ি বহর ‘দাসমান’ মহল থেকে বের হয়ে ‘সাইফ’ মহলে যাচ্ছিল। আমিরের গাড়িবহর দেখে ট্রাফিক সকল রাস্তার সিগন্যাল বন্ধ করে দু’পাশের রাস্তাগুলো খোলা রেখে দেয়, যেন গাড়িবহর থেকে কোনো গাড়ি ডানে-বামে যেতে চাইলে যেতে পারে। এ মুহূর্তে হটাৎ পার্শ্ব থেকে একটি গাড়ি গাড়িবহরের সামনে চলে এলো, সিকিউরিটি গার্ড তাকে থামাতে চেষ্টা করল, কিন্তু গাড়িটি সেখানেই বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হল, ফলে সিকিউরিটির প্রথম গাড়িটি যাত্রীসহ পুড়ে গেল, যাত্রীদের মধ্যে ছিল মুহাম্মদ আনাজি ও হাদি শামরি। বিস্ফোরণটি সিকিউরিটি গার্ডের দ্বিতীয় গাড়িকেও জোড়ে ধাক্কা দিল, ফলে বাম-পাশ থেকে আমিরের গাড়িকে আঘাত করে ফুটপাতে গিয়ে আছড়ে পড়ে, কিছুক্ষণের মধ্যে তাতেও আগুন ধরে।

---

[1] তখন এ সংগঠনের প্রধান ছিল মুহাম্মদ বাকের আল-হাকিম, ২০০৩ই. সালে ইরাকে তাকে অপহরণ করা হয়। সে কুয়েতের আমিরকে হত্যার ফতোয়া জারি করে। হত্যাকারী শহীদ ও জান্নাতী, হত্যায় অংশ গ্রহণকারীও জান্নাতী।

1২-জুলাই ১৯৮৫ই. সালে কুয়েত সিটিতে দু'টি কফির দোকানে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যার কারণে অনেকের প্রাণহানি ঘটে ও অনেকে জখম হয়।

২৯-এপ্রিল ১৯৮৬ই. সালে কুয়েতের নিরাপত্তা বাহিনী ঘোষণা করে যে, ১২-জন সন্ত্রাসী কুয়েতি এয়ার লাইনের ৭৪৭-বোয়িং বিমান অপহরণ করে পূর্ব এশিয়ার কোনো অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তারা নস্যাৎ করে দিয়েছে। এটাও কুয়েতি হিযবুল্লাহর কর্ম ছিল।

১৯৮৮ই. সালের ৫-এপ্রিল আলি আকবর মুহতাশেমী [1] 'হিযবুল্লাহ' কুয়েতির নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দেয় যে, তারা ইমাদ লেবাননির নেতৃত্বে ব্যাংকক থেকে আগত কুয়েতি এয়ার লাইনের 'আল-জাবেরিয়া' বিমান অপহরণ করে ইরানের 'মাশহাদ' নামক স্থানে পৌঁছে দিবে; আর তা ছিল লিবাননের হিযবুল্লাহ কমাণ্ডার ইমাদ মাগনিয়া'[2] এর নেতৃত্বে। বর্তমানে এ ইমাদ মাগনিয়াই লেবাননের হিযবুল্লাহর সশস্ত্র চীফ কমাণ্ডার[1]।

---

[1] যেমনটি কুয়েতস্থ আল-কাবস পত্রিকার ৫৭১৭ নং সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

[2] ইরানী গবেষক ড. মাসউদ আল্লাহী তার ডক্টরেট ডিগ্রীর থিসিসে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে, ছিনতাইকারীরা লেবাননী শিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিল; আর তারা হিযবুল্লাহ সংগঠনের অনুসারী ছিল। দেখুন গ্রন্থ: الإسلاميون في

তারা বিমানটি অপহরণ করতে সক্ষম হয়, বৈরুতে অবতরণ করার অনুমতি চাইলে কর্তৃপক্ষ নিষেধ করে দেয়। অতঃপর সাইপ্রাসের লারনাকা বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা করে, ইতোমধ্যে তারা আবদুল্লাহ আল-খালেদী ও খালেদ আইয়ূব নামীয় দু’জন কুয়েতি নাগরিককে গুলি করে হত্যার পর বিমানের বাইরে

مجتمع تعدّدي - حزب الله في لبنان نموذجاً، পৃ. ২৫২-২৫৪.

[1] গত ২০০৬, সালের ১১ ই আগষ্ট মোতাবেক ১৭ই রজব ১৪২৭ হিজরী শুক্রবারের আশ-শারকুল আওসাত্ব পত্রিকায় এসেছে: ইমাদ মাগনিয়াকে দক্ষিন ইরাকের বিভিন্ন শিয়া উপদলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তারপর তাকে দক্ষিন ইরাকে অবস্থিত ইরাকী গোয়েন্দা সংস্থার উপর খবরদারি করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। একই বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালে ইমাদ মাগনিয়া সিরিয়ার উপর দিয়ে লেবানন পাড়ি জমায়, তার সাথে রয়েছে বেশ কিছু ইরানী অফিসার। তার নাম হলো, সাইয়্যেদ মাহদী হাশেমী, তার পাসপোর্ট ইরানী, আর কূটনৈতিক পাসপোর্ট।

২০০৬ সালের প্রথমদিকে ইমাদ ফায়েয মাগনিয়াকে ইরাকের বসরায় দেখা গেল। বলা হয়ে থাকে, সে-ই জাইসুল মাহদীকে ইরানে নিয়ে প্রশিক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। গত এপ্রিলে ইমাদ মাগনিয়া আবার লেবাননে ফিরে এসে হিযবুল্লাহর গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইরানী নেতৃত্ব এ লোককে ‘শৃগাল’ নামে অভিহিত করে থাকে; আর লেবাননের হিযবুল্লাহ প্রধান ‘হাসান নাসরুল্লাহ’ তাকে ‘আল-হাজ!- হিসেবে সম্বোধন করে থাকে।

ফেলে দেয়। সর্বশেষ বিমানটি আলজেরিয়ায় গিয়ে অবতরণ করে, সেখান থেকে অপহরণকারীদের ছেড়ে দেয়া হয়।[1]

এ ঘটনার মাধ্যমে হিযবুল্লাহ কুয়েত সরকারের নিকট দাবি জানায় যে, তাদের কয়েদিদের ছেড়ে দেওয়া হোক, যাদেরকে **১৯৮৩ই.** সালে « الجهاد الإسلامي » সংগঠনের নামে বোমাবাজির কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য তারা একই দিন বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল কেন্দ্র, কুয়েত ইন্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্ট, আমেরিকান ও ফ্রান্সের দূতাবাস, পেট্রোল শোধনাগার এবং আবাসিক এলাকাসমূহে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, যে কারণে অনেক মানুষ হতাহত হয়। নিহতে সংখ্যা ৭ এবং আহতের সংখ্যা প্রায় ৬২। তারা সবাই সাধারণ নাগরিক ছিল, কেউ পেট্রোল শোধনাগারের ইঞ্জিনিয়ার এবং কেউ আবাসিক প্রকল্পের শ্রমিক।[2]

অনুরূপ তারা **১৯৮৩ই.** সালের প্রথমার্ধে একটি কুয়েতি এয়ার লাইন্স অপহরণ করে, যাতে প্রায় ৫০০ যাত্রী ছিল, যা নিয়ে তারা ইরানের মাশহাদ নামক এয়ার পোর্টে অবতরণ করে।

---

[1] দেখুন: 'জাবেরিয়া বিমান অপহরণের ঘটনা' مجلة الكويت সংখ্যা-৭০, জুলাই, **১৯৮৮ই.** এবং مجلة المستقبل সংখ্যা-৫৮২, এপ্রিল, **১৯৮৮ই.**

[2] দেখুন: حزب الله من الحلم الإيديولوجي إلى الواقعية السياسية (পৃ.৫৮-৬০)

কুয়েতি হিযবুল্লাহর সাথে উপসাগরীয় হিযবুল্লাহর সকল গ্রুপের সম্পর্ক ছিল। কুয়েতি হিযবুল্লাহ ইরাকি সেনাবাহিনীর রেখে যাওয়া অস্ত্র ও গোলা-বারুদ হস্তগত করে ১৯৯৬ই. সালে বাহরাইনি হিযবুল্লাহর নিকট হস্তান্তর করে, যেন তারা হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করতে পারে।

১০-জনু ১৯৯৬ই. সালে «الأنباء الكويتية» পত্রিকা প্রকাশ করে যে, ‘হিযবুল্লাহ কুয়েত’ ইরাকি সেনাবাহিনীর রেখে যাওয়া অস্ত্র ‘হিযবুল্লাহ বাহরাইন’ এর নিকট চালান করেছে[1]।

‘হিযবুল্লাহ কুয়েত’ রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় থেকে কতক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নব্বইয়ের দশকে আরেকটি কাণ্ড করে, তারা পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে তাকইয়া (তথা মিথ্যাচারের) আড়ালে রাজনৈতিক চুক্তি ও সমঝোতা করে এবং الائتلاف الإسلامي الوطني ‘জাতীয়তাবাদী ইসলামি জোট’ নামে একটি দল গঠন করে, যেন তাদের লক্ষ্য ও কৌশলগত পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এ জোটের কতক প্রতিষ্ঠাতা ও নেতৃবৃন্দ নিম্নরূপ: মুহাম্মদ বাকের মাহরি, আব্বাস ইবনে নাখি, আদনান ইবনে আব্দুস সামাদ, ড. নাসের সারখুহ ও ড. আব্দুল মুহসিন জামাল।

---

[1] ১০/জুন/১৯৯৬ ইং।

ইরানের শিয়া সরকার নতুনভাবে এ দলের সাথে কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর রিপোর্টে প্রকাশ [1], দক্ষিণ ইরাকে শিয়ারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে সেটাকে বিপ্লবী বর্ডার গার্ড ও ইরানী গোয়েন্দাদের অভয়ারণ্যে পরিণত করে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য কুয়েতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সরকারের পতন ঘটানো এবং একটি শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা। রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, তারা কুয়েতি শিয়াদের নিকট বিভিন্নভাবে অস্ত্র পাচার করছে, যাদের সম্পর্ক ইরানের সাথে।

আল্লাহ তা‘আলা কুয়েত ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোকে শিয়াদের ষড়যন্ত্র থেকে হিফাজত করুন।

---

[1] ‘আল-ওয়াতানুল আরাবী’ পত্রিকা, সংখ্যা, ১৫৪৫; ১১/১০/২০০৬ ইং।

হিযবুল্লাহ ইয়ামেন (ইয়ামেনের মাটিতে হিযবুল্লাহ)

‘হিযবুল্লাহ ইয়ামান’ নামে ‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ এর একটি শাখা ছিল[1], কিন্তু ‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ ও তার অঙ্গ-সংগঠনের হত্যা, গুম ও অপহরণের ন্যায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে ইয়ামানি জনগোষ্ঠী এ জাতীয় সংগঠন ও তার শাখা-প্রশাখা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তারা দ্বাদশ ইমামিয়া শিয়াদের দীনি আকিদা ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে ইয়ামেন সমাজকে করায়ত্ব করতে চেয়েছিল। তাই ইয়ামানি শিয়ারা এ নামের পরিবর্তে الشباب المؤمن নাম গ্রহণ করে। এটা খ্রিস্টীয় নব্বই দশকের ঘটনা।[2] ফলে বেশ কিছু যাইদিয়া শিয়া এতে যোগ দেয়, যারা ইতিপূর্বে শিয়া ‘দ্বাদশ ইমামিয়া’ গ্রুপে যোগ দিয়েছিল। আবার কতিপয় যাইদিয়া যারা ‘দ্বাদশ ইমামিয়া’ হয়নি, তাদেরকেও প্রতারণা করে এ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেন ইয়ামানে ইরানি শিয়াদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

‘হিযবুল্লাহ ইয়ামেন’ এর প্রধান হচ্ছে হুসাইন বদরুদ্দিন হাউসি[3]

---

[1] আয-যাহর ওয়াল হাজর, পৃ. ১৩০।

[2] এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য পড়ুন: الحرب في صعدة (পৃ.২৬) এবং الزهر والحجر (পৃ.১২৯)

[3] ১০/৯/২০০৪ই. সালে ৪৬বছর বয়সে তাকে হত্যা করা হয়।

তার পিতার নাম বদরুদ্দিন[1] হাউসি। তারা প্রথমে শিয়া ‘যাইদিয়া’ সম্প্রদায়ের শাখা জারুদিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, হাউসি [2] অল্প বয়সেই ‘জারুদিয়া’ ফেরকা থেকে শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া ফেরকায় যোগ দেয়। অতঃপর সে ইরান গিয়ে খোমেনির আদর্শ গ্রহণ করে নিজেকে পাক্কা দ্বাদশ ইমামিয়া প্রমাণ করে।[3]

---

[1] এখনো সে জীবিত, বর্তমান তার বয়স ৮৫বছর।

[2] কাতিফের শিয়া হাসান-সাফফারকে তার একজন ছাত্র গণ্য করা হয়, সে তার থেকে সার্টিফিকেট হাসিল করেছে। কিছু দিন আগেও ইন্টারনেটে হাসান সাফফারের ব্যক্তিগত পরিচয়ে উল্লেখ ছিল, তবে এসব ঘটনা প্রকাশ হওয়ার সে তা মুছে ফেলেছে।

[3] যায়দিয়া ফেরকা থেকে বহিষ্কৃত একটি দল, শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুব গভীর। শিয়া শায়খ আল-মুফিদ তো ইমামিয়া ও জারুদিয়া ব্যতীত কাউকে শিয়া গণ্য করে না। এ ফিরকাটি আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আহুমার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে না, তাদের দাবি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা ও বিশেষণ দ্বারা আলির খিলাফতের কথা বলেছেন, কিন্তু উম্মত ‘আলি’কে খিলাফত সোপর্দ করে গোমরাহ ও কাফের হয়ে গেছে। তারা বুখারি-মুসলিম ও সাহাবিদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করে না। দেখুন: أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية للقفاري (পৃ.১/৫১) এবং আরো দেখুন: মুহাম্মদ ঈজা শাবিবাহ রচিত: الحوثي ومستقبل الفتنة المجهول আর-রুশদ পত্রিকা, সংখ্যা-৩৩, তারিখ: ২৫/৪/২০০৫ই.

তার অনুসারী কয়েকজন বলেছেন, ১৯৯৭ই. সালে সে জারুদিয়া ফেরকা থেকে ‘জাফরি শিয়া’ মতবাদ গ্রহণ করে, যার অপর নাম ‘শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া’।[1]

দ্বাদশ ইমামিয়া মতবাদ গ্রহণ করার ফলে ইয়ামানের যাইদিয়া আলেমগণ হাউসি ও তার আন্দোলন থেকে নিজেদের বিমুক্ত ঘোষণা করেন, তারা بيان من علماء الزيدية শিরোনামে প্রজ্ঞাপন জারি করেন। এতে তারা হাউসির দাবিসমূহ প্রত্যাখ্যান করে মানুষদের সতর্ক করেন যে, আহলে বায়ত কিংবা যাইদী মতবাদের সাথে হাউসির কোনো সম্পর্ক নেই।[2]

‘শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া’দের ধারণা তাদের মাহদি বের হওয়ার পূর্বে অনেক বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংগঠিত হবে। ইরানি গবেষক আলি কোরানি জোর দিয়ে বলেন: এ বিপ্লবের নেতা হবে যায়েদ ইবনে আলির বংশধর থেকে। বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে যে, তার নাম হাসান অথবা হুসাইন হবে এবং সে বের হবে ইয়ামানের এক

---

[1] দেখুন: আদেল আহমদ রচিত: الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن» (পৃ.১৩৮)

[2] এ ঘোষণাটি দেখুন: আদেল আহমদি রচিত الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن» (পৃ.২৫৩, ৩৪৯), ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষরকারীগণ হলেন কাদি আহমদ শামি, যিনি হিজবুল হকের সাধারণ সম্পাদক, তার অধীনেই ছিল হাউসি।

গ্রাম থেকে, যার নাম হবে ‘কার‘আহ’। কোরানির মতে এটা ‘সা‘দাহ’ অঞ্চলের নিকটবর্তী।

এভাবে সে হাউসির বিপ্লব ও বিজয়ের প্রতি ইংগিত করেছে, যা তাদের মাহদির বিপ্লবের পূর্বাভাস!

হাউসি যে চিন্তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করে তার নির্যাস হচ্ছে শিয়াদের ইমামত ও ওসিয়ত এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। তাদের ঈমান হচ্ছে সাহাবিদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদিন; কারণ তাদের নিকট তারাই সকল সমস্যার মূল কারণ। তার দাওয়াতের অপর বিষয় হচ্ছে শরীয়ত ত্যাগ কর, শরীয়ত সাহাবিদের মাধ্যমে প্রাপ্ত।[1]

বদরুদ্দিন হাউসি বলেন: “আমি নিজে সাহাবিদের কুফরিতে বিশ্বাসী, কারণ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করেছে”।[2] বদরুদ্দিন হাউসি ‘খুমুস’[3] আদায় করে তার

---

[1] দেখুন: মাজলিসির রচনা ‘বিহারুল আনওয়ার’: (৫২/৩৮০)

[2] দেখুন: শিয়া আবু জাফর কর্তৃক বদরুদ্দিন হাউসি থেকে গৃহীত সাক্ষাতকার, যা শিয়া ওয়েব المعصومين الأربعة عشر সাইট রয়েছে।

[3] যুদ্ধ লব্দ গণিমতের এক পঞ্চমাংশকে খুমুস বলা হয়। কিন্তু দ্বাদশ ইমামিয়া শিয়াদের নিকট প্রত্যেক শিয়া ইমামের জন্য তার সম্পদের এক পঞ্চমাংশ অবশ্যই প্রদান করতে বাধ্য। [সম্পাদক]

নিকট জমা করার নির্দেশ দিয়েছে। [1] এ বিধান সে শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের থেকে গ্রহণ করেছে।

হাউসি নিজেকে শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া প্রমাণ করার জন্য 'কারবালার মাটি' সংগ্রহ করে তার উপর সেজদা করে।[2]

হাউসি ও তার পরিবার ইতোপূর্বে যাইদিয়া সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংগঠন 'হিজবুল হক' এর সদস্য ছিল । তার থেকে আলাদা হয়ে হাউসি الشباب المؤمن 'মুমিন যুবক' নামে নতুন দল গঠন করে। উত্তর ইয়ামানের 'সা'দা' নামক স্থানে এ সংগঠনটি সন্ত্রাসী ও বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড করে।

ইরান হাউসিকে অর্থনৈতিক, তাত্ত্বিক ও সামরিক যোগান দেয়, যেন সে ইয়ামানে খোমেনি বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়।[3]

---

[1] দেখুন: الحرب في صعدة (পৃ.২৫)

[2] দেখুন: الحرب في صعدة (পৃ.৩৯), তার আকিদা ও কথাবার্তা সম্পর্কে আরো অধিক জানার জন্য পড়ুন অত্র কিতাবের ৬৫ ও ১৩৩নং পৃষ্ঠা। আরো দেখুন النبأ اليقين في كشف حقيقة حسين بدر الدين এবং موقع مفكرة الإسلام ওয়েব সাইট।

[3] দেখুন: আদেল আহমাদি রচিত, الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن» (পৃ.১৩৪)

ইতোপূর্বে হিযবুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য হাউসি লেবানন গিয়েছিল, যেমন নব্বইয়ের দশকে সে ইরান গিয়েছিল । ১৯৯৭ই. সালের মধ্যবর্তী সে ইরান থেকে ইয়ামান ফেরত আসে।[1]

‘সান‘আ’য় অবস্থিত ইরানি দূতাবাস দ্বারা ইরান ‘হাউসি আন্দোলন’ ও ‘শাবাবুল মুমিন’ সংগঠনদ্বয়কে বিভিন্ন অনুদান প্রদান করে।

এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ইরান উত্তর ইয়ামানের ‘সা‘দায়’ আন্দোলনরত হাউসিকে প্রত্যক্ষ ও তার অঙ্গ- সংগঠনকে পরোক্ষভাবে ‘সান‘আ’য় অবস্থিত ইরানি দূতাবাসের মাধ্যমে ৪২- মিলিয়ন ইয়ামানি রিয়াল প্রদান করে।[2]

এ অনুদান ব্যতীত অন্যান্য শিয়া সংগঠন থেকেও প্রচুর অর্থ হাউসি ও তার সমর্থকরা লাভ করে, যেমন ইরানের কুম নগরীতে অবস্থিত مؤسسة أنصارين ‘মুয়াসসাসাতু আনসারিন’, লন্ডনে অবস্থিত مؤسسة الخوئي ‘মুয়াসসাসাতুল খুঈ’, কুয়েতে অবস্থিত مؤسسة الثقلين ‘মুয়াসসাসাতুস সাকলাইন’ ও লেবাননের হিযবুল্লাহ

---

[1] দেখুন: আদেল আহমাদি রচিত الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن» (পৃ.১৩৫), আরো দেখুন: الحرب في صعدة (পৃ.১০ ও ১৮)

[2] দেখুন: আহমাদ আদেল রচিত الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن» (পৃ.১৭৩)

থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য লাভ করে। এ ছাড়া আরো অনেক শিয়া সংগঠন ও সংস্থা তাদেরকে অনুদান দেয়।[1]

ইয়ামানি সরকারের ঘনিষ্ঠ একটি সংস্থা বলেছে যে, ইয়ামানে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সময় ও পূর্বে সৌদি শিয়ারা তাদেরকে অর্থ সাহায্য প্রেরণ করেছে।[2]

তাই ইয়ামানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আলি আব্দুল্লাহ সালেহ এক ভাষণে শিয়া ও ইরানি সম্পৃক্ততার প্রতি ইংগিত করে হাউসির বৃহৎ অর্থ ভাণ্ডার সম্পর্কে বলেন, এ অনুদান, অর্থ সাহায্য ও সামরিক প্রস্তুতি কখনো হাউসির পক্ষে ইয়ামান থেকে সংগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

সামরিক সহায়তা সম্পর্কে খবরে প্রকাশ যে, হাউসিকে সামরিক সাহায্য, অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ পরিচালনার জন্যে ইরাকি শিয়া ও ইরানি বিপ্লবী গার্ড ইয়ামানে গিয়েছিল।[3]

'আখবারুল ইয়াউম' পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় প্রকাশ করেছে যে, বিদ্রোহের সময় আত্মসমর্পণকারী হাউসির একাধিক সদস্য

---

[1] দেখুন: আহমাদ আদেল রচিত الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن» (পৃ.১৭২)

[2] দেখুন: صحيفة الوطن القطرية তারিখ: ১৭/৯/২০০৪ই.

[3] দেখুন: আদেল আহমাদি রচিত: «الزهر والحجر «التمرد الشيعي في اليمن (পৃ.১৭৬)

স্বীকার করেছে, তারা ইরানি বিপ্লবী গার্ড ও ইরাকি ফিলাক বদরের সদস্যদের নিকট সামরিক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।[1]

ইয়ামানি বিচার বিভাগ ইয়াহইয়া হুসাইন মুসা দায়লামিকে ইরান ও হাউসির মাঝে গোয়েন্দাগিরির অপরাধে ফাঁসির নির্দেশ প্রদান করে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ইয়ামানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী ইরান, তার উসকানিতে হাউসিরা এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে। অতএব কোনো সন্দেহ নেই উত্তর ইয়ামানের 'সা'দা'য় হাউসিদের ফেতনা সৃষ্টির মূল হোতা হচ্ছে ইরান।[2]

তাছাড়া হাউসি 'হিযবুল্লাহ লেবানন' এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাদের প্রশংসা করে, তাদেরকে আদর্শ জ্ঞান করে, এক পর্যায়ে হাউসি স্বীয় অধিকৃত কয়েকটি এলাকায় 'হিযবুল্লাহ লেবানন' এর পতাকা উত্তোলন করে ও বিক্ষোভ মিছিলে তা প্রদর্শন করে।[3]

---

[1] দেখুন: মাজাল্লাতুল বায়ানে প্রকাশিত আনওয়ার কাসেম আল-খুদরির প্রবন্ধ: তৃতীয় প্রকাশ ১৪২৭ই. (পৃ.৩৯১-৪১৯)

[2] দেখুন: ৩০মে, ২০০৫ই. সালে প্রকাশিত جريدة الحياة اللندنية ম্যাগাজিন এবং ৩০মে, ২০০৫ই. সালে প্রকাশিত ম্যাগাজিন, সংখ্যা ১৭০৪। পরবর্তীতে তাকে ক্ষমা করে শাস্তি লাঘব করা হয়।

[3] দেখুন: মাজাল্লাতুল বায়ানে প্রকাশিত আনওয়ার কাসেম আল-খুদরির প্রবন্ধ:

ইরানের কুম ও ইরাকের নাজাফ গবেষণাগার থেকে দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যেখানে হাউসিদের পক্ষাবলম্বন ও তাদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জানানো হয়। হাউসিদের দমন ও প্রতিহত করার কারণে ইয়ামানি সরকারের সমালোচনা করা হয় | ইয়ামানে শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের দাবি জানানো হয়। এসব কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে কুম ও নজফস্থ শিয়া ইলমী গবেষণাগার (হাউযা ইলমিয়্যা) ও হাউসি আন্দোলনের মাঝে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান | অথচ ইরাকে আহলে-সুন্নাহ নির্মূল করার লক্ষ্যে 'জায়শে মাহদি' ও 'ফায়লাক বদর' যে হত্যা, গুম ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, সেসব বন্ধ করার জন্য ইরান কোনো ইশতিহার প্রকাশ করেনি।[1]

তৃতীয় প্রকাশ ১৪২৭ই. (পৃ.৩৯১-৪১৯), অনুরূপ (পৃ.১৩৮, ১৭৫), অনুরূপ (পৃ.১২), টিভির পর্দায় তাদের বিক্ষোভ মিছিল প্রত্যক্ষকারীগণ হিযবুল্লাহ লেবাননের পতাকা দেখেছে|

[1] ইরাক-ইরান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ইশতিহার ও তাদের প্রতিবাদ করে ইয়ামানি আলেমদের জবাব দেখুন: الحرب في صعدة (পৃ.১০৭-১১১), অনুরূপ الزهر والحجر (পৃ.২৮১)

‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উদ্দেশ্য

হিযবুল্লাহর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য:

‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ মুসলিমদেরকে ধোঁকায় ফেলে তাদের গোপন পরিকল্পনা থেকে গাফেল রাখে। তারা মুসলিমদের অন্তরকে তাদের দিকে ধাবিত ও তাদের সমর্থন হাসিলের জন্য প্রকাশ্যভাবে “ইসরাইলি দখলদারের বিরুদ্ধে লেবাননি ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন” ও “ফিলিস্তিনি পবিত্র ভূমিসমূহ মুক্ত করার আন্দোলন” নাম গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ ইরান থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে লেবাননে মানবিক ও সামাজিক সেবা প্রদান করে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়।

হিযবুল্লাহর গোপন উদ্দেশ্য: লেবাননে শিয়া মতবাদের প্রসার ঘটানো, তাদের স্থায়ী অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলো করায়ত্ব গ্রহণ করা ও ইরানের জন্য লেবাননি জমিকে প্রস্তুত করা, যেন যখন ইচ্ছা ইরান লেবানন থেকে তার পার্থিব স্বার্থ, ধর্মীয় লক্ষ্য ও সাম্প্রদায়িক ইচ্ছা পূরণে সক্ষম হয়। আবার লেবাননের ভূগর্ভস্থ অভ্যন্তরিণ কাঠামোতে আঘাত করে তাকে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়াও তার একটি লক্ষ্য, যেন লেবাননের উপর তারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়। এভাবে ইসলামি বিশ্বে ইরানি বিপ্লব ব্যাপক করে খোমেনির

আদলে শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র অবশ্যই নস্যাৎ করবেন।

‘হিযবুল্লাহ লেবানন ও খোমেনি এবং তাদের আকিদা

শরীরের সাথে যেরূপ রূহের সম্পর্ক তেমনি খোমেনির সাথে হিযবুল্লাহর সম্পর্ক। ‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ ইসলামি বিশ্বে শিয়া মতবাদ প্রচার ও তার বাস্তবায়নে খোমেনিকে আদর্শ জ্ঞান করে ও তার দেখানো পথে হাঁটে।

‘হিযবুল্লাহ লেবানন’-এর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক গুরু হলেন খোমেনি। হিযবুল্লাহকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া, তার প্রতি খোমেনির আদেশ ও উপদেশ প্রেরণ করা ও তাদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ইরানি সুপ্রিম ডিফেন্স কাউন্সিলকে খোমেনি কর্তৃক দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[1] তাছাড়া হিযবুল্লাহর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও খোমেনি কর্তৃক নির্ধারিত হয়।[2]

ইরানি ধর্ম মন্ত্রণালয় নিজস্ব ওয়েব সাইটে এক প্রজ্ঞাপন জারি করে হাসান নাসরুল্লাকে লেবাননে ইমাম খোমেনির প্রতিনিধির স্বীকৃতি দিয়েছে।

---

[1] ইরানি সুপ্রিম ডিফেন্স কাউন্সিলের কর্মকর্তা হচ্ছেন, আলি খামেনেয়ী, আলি আকবার হাশেমি রাফসানজানি ও মুহসিন ওফায়ি প্রমুখগণ। তারা হিযবুল্লাহকে পর্যবেক্ষণ ও দেখা-শুনা করে।

[2] দেখুন: مجلة الشراع، ملف عن حزب الله তারিখ: ১৭মার্চ, ১৯৮৬ই. (পৃ.১৯), তাওফিক মাদিনি রচিত, أمل وحزب الله থেকে সংগৃহীত, (পৃ.১৪০-১৪১)

ইরানি বিপ্লবী গার্ডের সাবেক প্রধান হাসান রিদায়ি পরিচালিত ‘বাজতাব’ «بازتاب» ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে, খোমেনি ১৯৮১ই. সালে উত্তর তেহরানের জমারান হুসাইনিয়াতে ‘হরকতে আমালের’ নেতাদের সাথে হাসান নাসরুল্লাহকে অভ্যর্থনা প্রদান করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২১-বছর।

ওয়েব সাইটে আরো প্রকাশ যে, হাসান নাসরুল্লাহ ও তার সাথীদের ইমাম খোমেনি বলেছেন: আপনারা অতিসত্বর লেবাননের সরকারকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন।

এ সভায় হাসান নাসরুল্লাহকে ইমাম খোমেনি খুমুস-যাকাত ও কাফফারা উসুল করে সেগুলোকে কল্যাণকর কাজ ও দীনি খাতে খরচ করার অনুমিত প্রদান করেন, খোমেনি এ দায়িত্ব সাধারণত শিয়া কোনো আলেমকে প্রদান করতেন না, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ‘হাসান নাসরুল্লাহ’ ইরানের খোমেনির খুব বিশ্বস্ত ছিল। আমাদের এ কিতাবের পরিশিষ্টতে “খোমেনি কর্তৃক হাসান নাসরুল্লাহকে অনুমতি প্রদান ও তাকে প্রতিনিধি স্বীকৃতি দেওয়ার আরবি পত্রের দলিল রয়েছে”। ইমাম খোমেনি হাসান নাসরুল্লাহকে ‘হুজ্জাতুল ইসলাম আলহাজ্ব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ বলে সম্বোধন করেছেন’। এ জাতীয় উপাধি প্রমাণ করে হাসান নাসরুল্লাহ তাদের নিকট উঁচু মর্যাদা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

খোমেনির মৃত্যুর পর ইরানের অভিভাবক নির্ধারিত হন আলি খামেনি, তিনি শিয়াদের অভিভাবক ও ফকিহ, ‘হিযবুল্লাহ লেবানন’ দীনি ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে তার শরণাপন্ন হয়।

ইরানি বিপ্লবের বর্তমান অভিভাবক আলি খামেনি লেবাননে তার দু’জন প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছেন: শায়খ মুহাম্মদ ইয়াজবেক (হিযবুল্লাহর সদস্য) এবং সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ। তারা উভয়ে আলি খামেনির প্রতিনিধি হিসেবে লেবাননের শিয়া জনগণ থেকে শরয়ী পাওনা উসুল করে সেগুলো শিয়াদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করে। তাদের প্রয়োজন হলে তারাও কাউকে প্রতিনিধি করতে পারবে।[1]

‘বিলায়াতুল ফকিহ’ থিউরি খোমেনি[2]র উদ্ভাবিত। এ থিউরি মতে ইমামের অনুপস্থিতিতে জিহাদে আকবর ব্যতীত ফকিহ যাবতীয়

---

[1] দেখুন: جريدة السفير ১৮/৫/১৯৯৫ই.

[2] খোমেনীকে প্রথম প্রথম কোনো কোনো আহলে সুন্নাত সমর্থন করেছিল। কারণ সে যখন নির্বাসিত জীবন যাপন করছিল তখন সে সব শ্লোগান দিয়েছিল তাতে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ যখন সে ইরানে তার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল তখন সে আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের বহু আলেমকে সে হত্যা করেছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলেম ছিলেন ‘আহমাদ মুফতী যাদাহ’, তিনি খোমেনীর কাছে আহলে সুন্নাতের জন্য তেহরানে একটি মসজিদ নির্মাণের দাবী জানিয়েছিলেন। এতে খোমেনী ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ এবং

সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, তেহরানই হচ্ছে বিশ্বের এমন একমাত্র স্থান যাতে সুন্নী মুসলিমদের কোনো মসজিদ নেই। অথচ সেখানে ইয়াহূদীদের উপাসনালয়, খৃষ্টানদের গীর্জা ও যরথুস্ত মাজুসদের ইবাদতের স্থান রয়েছে।

তাছাড়া খোমেনী যে আমেরিকাকে 'বড় শয়তান' বলে তার বিভিন্ন ভাষণে উল্লেখ করে থাকেই তার সরকারই ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় আমেরিকা থেকে অস্ত্র ক্রয়ের গোপন চুক্তি করেছিল, যা ইরান-গেট নামে প্রসিদ্ধ। আর সেটা সংঘটিত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট রিগানের সময়।

অনুরূপভাবে 'সানডে টাইমস' পত্রিকা তার ২৬/৭/১৯৮১ সংখ্যায় একটি রোডম্যাপ উল্লেখ করেছে যাতে দেখানো হয়েছে কিভাবে আর্জেন্টিনার বিমান ইসরাইলী অস্ত্র-শস্ত্র ইরানে হস্তান্তর করে। এমনকি আরব-লীগও তাৎক্ষনিকভাবে ইরান ও ইসরাইলের মধ্যে এ অস্ত্র-চুক্তির নিন্দা করেছে। ইরান কর্তৃক আরব রাষ্ট্র ও উপসাগরীয় দেশগুলোকে যে সকল হুমকি ও ধমকি প্রদান করে আসছে ইসরাইলের সাথে ইরানের এ অস্ত্র সহযোগিতা চুক্তি প্রমাণ করে যে ইরান আল-কুদস মুক্ত করার ব্যাপারে যত কথা ও বাগড়ম্বর করেছে ও করছে সবই নির্লজ্জ মিথ্যাচার।

দেখুন, আরব লীগের সিদ্ধান্ত (ক্ক ৪৭১৫ দ. অ. ৮৮, খ.৩-২২/৯/১৯৮৭)

ইসরাইল-ইরান সহযোগিতা চুক্তি ও তাদের মধ্যকার সম্পাদিত অস্ত্র চুক্তিসমূহ সম্পর্কে আরও বেশি জানতে হলে দেখুন, শাইখ মুহাম্মাদ মালুল্লাহ এর গ্রন্থ, 'মাওকেফুশ শিয়া মিন আহলিস সুন্নাহ' পৃ. ১২৬ ও তার পরের পৃষ্ঠাসমূহ। আরও দেখুন, 'আত-তা'আউন আত-তাসলীহি আল-ইরানী আস-সাহয়ূনী, আরদ্ব ও তাহলীল, গ্রন্থকার, মুনসী সালামাহ ও হাফেয আবদুল ইলাহ.

কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিবে । উল্লেখ্য শিয়াদের মৌলিক কিতাবে এ থিউরির কোনো অস্তিত্ব নেই।

রাফেযী খোমেনির দৃষ্টিতে দ্বাদশ ইমামগণ নবী ও রাসূলদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। খোমেনি বলেন: “নিশ্চয় ইমামের জন্য একটি মাকামে মাহমুদ, উঁচু মর্যাদা ও পার্থিব জগতে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা রয়েছে, তার বিলায়াত ও কর্তৃত্বের সামনে পৃথিবীর প্রতিটি অণু বশ্যতা স্বীকার করে। আমাদের মাযহাবের মৌলিক একটি আকিদা হচ্ছে: ইমামদের একটি মাকাম রয়েছে, সে পর্যন্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো মালায়েকা ও প্রেরিত কোনো নবী পৌঁছতে পারে না”।[1]

খোমেনি ওয়াহদাতুল ওজুদের মত কুফরি ও শির্কী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি বলেন: “আমাদের জন্য আল্লাহর সাথে বিশেষ কিছু অবস্থা রয়েছে, যেখানে আমরাও আল্লাহ বনে যাই এবং তিনি আমরা হয়ে যান। তিনি তিনিই , আর আমরা আমরাই”।[2]

খোমেনি আল্লাহর তকদীরের উপর আপত্তি করেন, তকদীরের ব্যাপার নিয়ে তার রবের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেন, কারণ তকদীরের দাবির প্রেক্ষিতে উসমান, মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদ শাসন

---

[1] দেখুন: «الحكومة الإسلامية» (পৃ.৭৫)

[2] দেখুন: «شرح دعاء السحر »(পৃ.১০৩)

করার সুযোগ লাভ করেছে। যে আল্লাহ এরূপ তকদীর নির্ধারণ করেন, সে আল্লাহকে খোমেনি চান না, তার থেকে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন। [তার কথা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই]। তিনি বলেন: “আমরা এমন এক ইলাহের ইবাদত করি, যার সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে, তার কাজগুলো বিবেক সমর্থিত, তিনি এমন কাজ করেন না, যা বিবেক সমর্থন করে না। আমরা এমন আল্লাহর ইবাদত করি না, যিনি প্রভুত্ব, ইনসাফ ও দীনের অট্টালিকা নির্মাণ করে, অতঃপর নিজ হাতে তা ধ্বংস করেন এবং ইয়াজিদ, মুয়াবিয়া, উসমান ও তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আবার নবীর পরবর্তীতে মানুষের করণীয়ও ঠিক করে দেন না; যেন তারা কিয়ামত পর্যন্ত জুলম ও অত্যাচারের পক্ষে অবস্থান না করে।[1]

খোমেনির বিশ্বাস, মানুষের আমলনামা শিয়াদের মাহদির নিকট পেশ করা হয়, তিনি বলেন: “বর্ণনা মতে আমাদের আমলগুলো সপ্তাহে দু’বার ইমাম সাহেবুজ্জামানের নিকট প্রেরণ করা হয়”।[2]

খোমেনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপবাদ দেয় যে, “তিনি দাওয়াতি ক্ষেত্রে তাওফিক প্রাপ্ত ছিলেন না” । সে বলে: প্রত্যেক নবীই ইনসাফ কায়েম করার জন্য এসেছেন, তাদের ইচ্ছা

---

[1] দেখুন : «كشف الأسرار» (পৃ.১১৬)

[2] দেখুন: «المعاد في نظر الإمام الخميني» (পৃ.৩৬৮)

ছিল দুনিয়ার বুকে তার বাস্তবায়ন করা, কিন্তু তারা সফল হননি, শেষ নবীও সফল হননি, যদিও তিনি এসেছেন মানুষের সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করা এবং তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। প্রকৃতপক্ষে যিনি সর্বতোভাবে সফল হবেন ও দুনিয়ার বুকে ইনসাফ কায়েম করবেন, তিনি হলেন মাহদি মুনতাযার"।[1]

খোমেনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফাদের অপবাদ দিয়ে বলে, আবু বকর ও ওমর কুরআনের বিরোধিতা করেছে, আর মানুষেরা তাই তাদের থেকে গ্রহণ করেছে। মূলত তার নিকট সকল সাহাবি কাফের ও গোমরাহ, কারণ খোমেনি যে বিকৃতির কথা বলে, সেগুলো সকল সাহাবি গ্রহণ করেছে, তবে খোমেনি হয়তো ভুলে গেছে যে, সকল সাহাবির মধ্যে আহলে বাইতও আছেন।[2]

খোমেনি আহলে সুন্নাহকে অপবাদ দেয়, তাদেরকে ‘নাওয়াসিব’ ও ‘নাপাক’ বলে এবং তাদের সম্পদ হালাল ফতোয়া দেয়। একদা সে বলে: "গ্রহণযোগ্য মতে নাসেবিদের[3] থেকে যে সম্পদ তোমরা

---

[1] দেখুন: «مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني» (২/৪২)

[2] দেখুন: «كشف الأسرار» (১২২)

[3] ‘নাসেবি’ বলতে আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের বুঝায়, কিন্তু শিয়ারা «الناصبي» নাসেবি বলে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতকে বুঝায়। এ কথা তাদের শায়খ হুসাইন দারাজি স্বীয় কিতাব «المحاسن النفسانية في

গ্রহণ কর সেগুলো হারবি-কাফেরদের ন্যায় তোমাদের জন্য হালাল, তার উপর খুমুসের বিধান প্রযোজ্য হবে। তাদের সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ যেখানে পাওয়া যাক, যেভাবে হোক এবং তার খুমুস বের করা ওয়াজিব"।[1] সে আরো বলে: "নাসিব ও খারিজিদের উপর আল্লাহর লানত, তারা উভয়ে বিনা দ্বিধায় কাফের"।[2]

খোমেনির সমস্যা আরো অনেক, অধিক জানার জন্য দেখুন, ড. যায়েদ আল-'ঈস রচিত (الخميني والوجه الآخر) অথবা http://www.khomainy.com ওয়েব সাইট ব্রাউজ করুন, এ ছাড়া অন্যান্য কিতাবও দেখুন।

«أجوبة المسائل الخراسانية» (পৃ.১৪৭) এ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন: "ইমামদের কথা প্রমাণ করে, নাসেবি দ্বারা উদ্দেশ্য আহলে-সুন্নাহ"। অতঃপর একই পৃষ্ঠায় তিনি বলেন: "এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, নাসেবি দ্বারা আহলে-সুন্নাহ উদ্দেশ্য"। শায়খ সাদুক علل الشرائع গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সনদে সাদেক থেকে বর্ণনা করেন: "আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী নাসেবি নয়, কারণ তুমি কাউকে বলতে শুনবে না, আমি মুহাম্মদ কিংবা তার আহলে বাইতকে অপছন্দ করি, তবে নাসেবি হচ্ছে তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, কারণ সে জানে তোমরা আমাদের ও আমাদের দলের লোক'।

[1] দেখুন: « «تحرير الوسيلة» (১/৩১৮)

[2] দেখুন: « «تحرير الوسيلة» (১/১০৭)

ইরান ও হিযবুল্লাহ

ইরান হিযবুল্লাহর ধমনী, সঞ্জীবনী শক্তি ও মূল কেন্দ্র। ইরান থেকে হিযবুল্লাহ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা লাভ করে। আর “ইরান ও লেবাননে তার শক্তিসমূহের সাথে এ যোগাযোগের মূলসূত্র হচ্ছে, হাসান নাসরুল্লাহ।[1]”

৫/৩/১৯৮৭ই. সালের এক সভায় হিযবুল্লাহর মুখপাত্র ইবরাহিম আমিন বলেন: “আমরা বলি না যে, আমরা ইরানের একটি অংশ, বরং আমরা ইরানে লেবানন এবং লেবাননে ইরান”। [2] হিযবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল হাসান নাসরুল্লাহ বলেন: “আমরা ইরানকেই এমন এক রাষ্ট্র দেখি, যে ইসলাম দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং মুসলিম ও আরবদের সাহায্য করে। ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক। ইরানের নেতৃবৃন্দের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব, আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি। অনুরূপ সেখানকার ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহ আমাদের যোদ্ধাদের দীনি ও শরয়ী সকল প্রয়োজন পূরণ করে”।[3]

---

[1] দেখুন: তাওফিক মাদানি রচিত أمل وحزب الله في حلبة المجابهات (পৃ.১৩৯)

[2] দেখুন: جريدة النهار ৫/৩/১৯৮৭ই.

[3] দেখুন: المقاوم ম্যাগাজিন (পৃ.১৫-১৬), সংখ্যা: (২৭) حزب الله رؤية مغايرة কিতাব থেকে সংগৃহীত (পৃ.৩২)

ইমাম মাহদি মসজিদের ইমাম শায়খ হাসান তিরাদ বলেন: “নিশ্চয় ইরান ও লেবানন এক জাতি ও এক দেশ। আমাদের কোনো আলেম বলেছেন: “নিশ্চয় আমরা যেরূপ ইরানের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনকে সাহায্য করব, অনুরূপ সাহায্য করব লেবাননকে”।[1]

ইবরাহিম আমিন বলেন: “আমরা ইমামের অবর্তমানে বাস করছি, এ যুগে ইমামের নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ ফকিহদের নেতৃত্ব।”

“এ হচ্ছে হিযবুল্লাহর বৈশিষ্ট্য, তারা লেবাননি জনগণকে ন্যায়পরায়ণ ‘ ফকিহ’র সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে হিযবুল্লাহ ন্যায়পরায়ণ ‘ফকিহ’র নির্দেশের ভিত্তিতে স্বীয় আন্দোলন ও সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে”।[2]

‘হিযবুল্লাহ লেবানন’-এর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল নু‘আইম কাসেম বলেন: “হিযবুল্লাহ ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্ক হিযবুল্লাহই তৈরি করেছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ইরানি বিপ্লব[3] থেকে উপকৃত হওয়া ও ইসরাইলি দখলদারিত্বের মোকাবেলায় তার সাহায্য হাসিলের

---

[1] দেখুন: جريدة النهار اللبنانية (১১/১২/১৯৮৬ই.

[2] দেখুন : الحركات الإسلامية في لبنان (১৪৬-১৪৭)

[3] খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে বিলায়াতুল ফকিহর আদলে ঘটিত বিপ্লব।

উদ্দেশ্যে। এ সম্পর্ক খুব দ্রুত উন্নত হয় এবং প্রথম ধাপেই তার ফলাফল ভোগ করেছি, কয়েকটি কারণে:

১. হিযবুল্লাহ ও ইরান উভয় বিলায়াতুল ‘ ফকিহ’র আদর্শে বিশ্বাসী এবং খোমেনি হচ্ছে তাদের নেতা। অতএব তারা উভয় বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় এক নেতার নেতৃত্বে বিশ্বাসী।

২. ইরান রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে ইসলামি প্রজাতন্ত্র গ্রহণ করেছে, তার মৌলিক বিষয়ের সাথে হিযবুল্লাহ একমত, তবে এলাকার ভিন্নতার কারণে আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে।

৩. উভয়ের রাজনৈতিক আদর্শে মিল, কারণ ইরানের মূল উদ্দেশ্য উপনিবেশকে ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, স্বাধীনতা আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা এবং ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিপরীত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। হুবহু এসব আকিদাই পোষণ করে হিযবুল্লাহ, তার প্রথম লক্ষ্য ইসরাইলি দখলদারিত্ব ও তার আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ইরান যেরূপ ইসলাম বাস্তবায়নে জীবন্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী[!!], যা বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখে প্রত্যেক দ্বীনদার মুসলিম... অনুরূপ হিযবুল্লাহ আধিপত্য রোধে বিরাট অভিজ্ঞতার মালিক, সে ইরান ও তার জনগণের সন্তুষ্টি অর্জন সক্ষম হয়েছে...

যখন হিযবুল্লাহ দক্ষিণ লেবানন ও পূর্ব বেক্কা নগরী ইরানের সাহায্যে মুক্ত করে, তখন সে তার উদ্দেশ্য হাসিল করে, যার ঘোষণা সে দিয়েছিল এবং যার জন্য সে ত্যাগ স্বীকার করেছে। অনুরূপ ইরানও আধিপত্যবাদ প্রতিরোধ ও মুজাহিদদের সাহায্য করে সফল অর্জন করেছে। এটা হিযবুল্লাহর অর্জন, লেবাননের অর্জন এবং ইরানের অর্জন"।

এখানে আমরা ইরানের মুখোশ উন্মোচন করতে চাই, ইয়াহূদীদের সাথে তাদের শত্রুতার দাবী মূলত প্রতারণা, ইসরাইলি রাষ্ট্রের উপর হামলার হুমকি মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার নামান্তর, দেখুন ইয়াহূদী সাংবাদিক 'ইউসি মালিমান' কি বলে:

"এটা কোনোভাবে সম্ভব নয় যে, ইসরাইল ইরানের পারমানবিক স্থাপনাসমূহে হামলা করবে, উপরন্তু একাধিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছে যে, ইরান যদিও কথার মাধ্যমে ইসরাইলের উপর হামলা করে, যা থেকে তার সাথে ইরানের শত্রুতা বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে ইরানি পারমানবিক বোমাগুলো আরব রাষ্ট্রসমূহের দিকে তাক করা"।[1]

উল্লেখিত ইয়াহূদীর কথার সত্যতা ড. গাসসানের মন্তব্য থেকেও হয়, তিনি বলেন: হিযবুল্লাহর প্রয়োজন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দর্শন ও

---

[1] দেখুন: جريدة الأنباء সংখ্যা: (৭৯৩১) لوس أنجلس تايمز থেকে সংগৃহীত।

চিন্তামূলক স্পষ্ট উদ্দেশ্য, যা হবে ইরানি দৃষ্টি কোন্ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এরাবিক ও ইসলামিক বৈশিষ্ট্যের ধারক। হিযবুল্লাহর আরো প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে থাকবে ইতিহাস ও দেশীয় কালচার। তার আরো প্রয়োজন একটি স্পষ্ট সংগঠন, যার মধ্যে থাকবে প্রচলিত সবধরনের অস্ত্র, যেন সে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।[1]

হিযবুল্লাহর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ইরান তাতে সর্বাত্মকভাবে অংশ গ্রহণ করে। 'আমাল' সংগঠনের সাবেক পরিচালক ও হিযবুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা সায়্যেদ হুসাইন মুসাভি বলেন: 'আমাল' সংগঠনের বর্তমান প্রধানের 'লেবানন উদ্ধার আন্দোলনে' যোগ দেওয়া ইসলাম সমর্থিত নয়। তিনি বলেন: ইসলামি ও অনৈসলামি বলার অধিকার মূলত ইরানের, কারণ ইসলামি বিপ্লব ঠিক করবে কোনটি ইসলামি ও কোনটি ইসলামি নয়। 'আমাল' সংগঠনের ১৯৮২ই. সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ৪-র্থ সম্মেলনে আমরা সবাই এ শপথ গ্রহণ করেছি যে, আমরা ইসলামি বিপ্লব ইরানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ"।[2]

---

[1] দেখুন: ড. গাসসান রচিত: حزب الله من الحلم الإيديولوجي إلى الواقعية السياسية (পৃ.৯)

[2] দেখুন: (الحركات الإسلامية في لبنان) তারিখ: ১৯৮৪ই. (পৃ.২২২ ও ২২২)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১৮/৩/১৯৯৬ই. সালে جريدة الوسط ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাতকারে হাসান নাসরুল্লাহ সত্যের অপলাপ করেছেন। তিনি তাতে বলেন: “হিযবুল্লাহর ভিত্তি লেবাননি, তার সিদ্ধান্ত লেবাননি এবং তার ইচ্ছাও লেবাননি। ইরান বা সিরিয়ান সমর্থন বা সাহায্য এসেছে পরবর্তীতে”। হিযবুল্লাহ ইরানের সন্তান, এ কথার সত্যতা হিযবুল্লাহর সাবেক প্রধান ‘সুবহি তুফাইলি’র সাক্ষাতকার থেকেও প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন: “আমি ইরানি প্রজাতন্ত্র দেখতে গিয়েছিলাম, তখন লেবাননে একটি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে ঐকমত্য হই। তারপর থেকে হিযবুল্লাহ তার কার্যক্রম আরম্ভ করে, হাজার হাজার ইরানি এসে তাকে অনুদান দেয় ও তার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে”।[1]

ইরান হিযবুল্লাহ প্রতিষ্ঠায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দান ও অর্থ সাহায্যের জন্যে নিজস্ব বিপ্লবী গার্ডকে লেবাননে প্রেরণ করে। লেবাননে আগত ইরানি বিপ্লবী গার্ডের সংখ্যা ২০০০-সদস্য। ইরানের বিপ্লবী গার্ড লেবাননে এসে আরো কিছু কাজ করে, যেমন লেবাননের বেক্কা প্রদেশ ও হিযবুল্লাহর

---

[1] দেখুন: ২৩/৭/২০০৩ই. সালে আল-জা যীরা টেলিভিশনে দেওয়া তার সাক্ষাতকার।

কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে শিয়া আকিদা প্রচার করে, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন এনজিও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।[1]

তাছাড়া তেহরানে হিযবুল্লাহর একটি বিশেষ অফিস রয়েছে, সেখান থেকে প্রচারপত্র ও বিভিন্ন বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়, তাতে হিযবুল্লাহর পরিচয়, তার কর্ম ও বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ থাকে। অনুরূপ ইরান থেকে যেসব সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ বের হয়, সেগুলো লেবাননে পৌঁছানোর দায়িত্বও সে অফিসের।[2]

হিযবুল্লাহ তাদের গ্রন্থসমূহে স্বীকৃতি দিয়ে লিখে থাকে যে, “কেন্দ্রীয় ফকিহ [ইরানি ধর্মীয় সর্বোচ্চ নেতা] একমাত্র যুদ্ধের সিদ্ধান্ত কিংবা আপোষ করার ক্ষমতা রাখে”।[3]

কেননা স্থানীয় ফকিহর এমন কর্তৃত্ব নেই, যা “বিশ্বের সকল শিয়াদের উপর প্রযোজ্য হয়”। তাই “ইমাম খোমেনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, বিশ্বের সকল জায়গায় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে শিয়া মুসলিমদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন ও তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন।[4]”

---

[1] দেখুন: كينيث كاتزمان রচিত الحرس الثوري الإيراني (পৃ.১৩৯ ও ১৯২)

[2] দেখুন: মাসউদ আসাদ ইলাহি রচিত الإسلاميون في مجتمع تعددي (পৃ.৩৬)

[3] দেখুন: হিযবুল্লাহর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি রচিত حزب الله (পৃ.৭২)

[4] দেখুন: হিযবুল্লাহর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি রচিত حزب الله (পৃ.৭৫)

তার এ কথা আমাদেরকে স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, বিশ্বের শিয়ারা ইরানি বিপ্লবের অনুসারী, ইরানের সাথে তারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, ইরানের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকরী। বিশেষভাবে সরাসরি ইরানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সংস্থাসমূহ, যেমন হিযবুল্লাহ, হিযবুল্লাহর অঙ্গ-সংগঠন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ ইরানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ইরান-ইরাক যুদ্ধে কি লেবাননী হিযবুল্লাহ ইরানের সাথে যোগ দিয়েছিল? আওয়াযে সুন্নী ছাত্রদের অসন্তোষ দমনেও কিতারা অংশ নিয়েছিল?

ইরাক-ইরান যুদ্ধ ও ইরানের ‘আহওয়ায’ নগরীতে সুন্নি ছাত্রদের আন্দোলন দমনে হিযবুল্লাহ অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৯৯৯ই. সালে ইরানের খোযিস্তান প্রদেশের রাজধানী আহওয়ায নগরীর ছাত্র-বাসিন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সাথে সৃষ্ট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও তার পরবর্তী ঘটনাসমূহে ইরানি সরকারের পক্ষে অংশ নেয় হিযবুল্লাহ। ছাত্র-বিদ্রোহে অংশ নেওয়া নেতাদের ব্যতীত একাধিক সূত্র ও এরাবিক গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, শতশত আরব যোদ্ধা (হিযবুল্লাহর সদস্য) নিরাপত্তা বাহিনী ও বিপ্লবী গার্ডের পক্ষ হয়ে ছাত্রদের দমন করে ও তাদের (আরব ইরানি) বিদ্রোহ নিঃশেষ করে দেয়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি বিষয় নিশ্চিত প্রমাণিত যে, ইরানি নিরাপত্তা বাহিনী ও বিপ্লবী গার্ডের ইউনিটে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধারা ‘ইরাকি ইসলামি [শিয়া] বিপ্লবের সর্বোচ্চ পরিষদে’র অনুগত ‘ফিলাক বদর’ এর সামরিক শাখার সদস্য।

তবে নিরাপত্তা বাহিনীর কতক লোকের ভাষা ছিল লেবাননি ও সিরিয়ানদের ন্যায়, যা থেকে তাদের জাতীয়তা সম্পর্কে সন্দেহে র উদ্রেক করেছে! তার প্রমাণ মিলেছে কিছু দিন পূর্বে দেওয়া আলি

আকবর মুহতাশিমি বুর-এর ভাষণে, তাকে হিযবুল্লাহর ধর্মীয় পিতা জ্ঞান করা হয়। ইতোপূর্বে তিনি ইরানের পক্ষ থেকে সিরিয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ইরানের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সভার সেক্রেটারিও ছিলেন তিনি | ১৯৮২ই. সালে তিনিই ‘হরকতে আমাল’ থেকে হিযবুল্লাহর জন্ম দেন। তিনি বলেছেন: ইরান-ইরাক যুদ্ধে বিপ্লবী গার্ডের পাশাপাশি হিযবুল্লাহর যোদ্ধারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিল।

গত বুধবার ‘আলি মুহতাশিমি বুর’ ইরানি সংবাদ «شرق» ‘শারক’কে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে হিযবুল্লাহ ও লেবাননের সর্বশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলেন, (উল্লেখ্য যে, তিনি ইমাম খোমেনির ছাত্র ও হুজ্জাতুল ইসলাম খেতাব প্রাপ্ত) “ হিযবুল্লাহর অভিজ্ঞতার একাংশ যুদ্ধের ময়দান থেকে শেখা, আর দ্বিতীয় অংশ শিখেছে প্রশিক্ষণ থেকে, সন্দেহ নেই ইরান-ইরাক যুদ্ধ থেকে হিযবুল্লাহ অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কারণ হিযবুল্লাহর সদস্যরা আমাদের বাহিনীর পাশা-পাশি অথবা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত”|

‘মুহতাশিমি বুর’ হিযবুল্লাহর শক্তি সম্পর্কে আরো বলেন: “শেষের বছরগুলোতে লেবানন ও তার অঞ্চলসমূহে হিযবুল্লাহ রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করেছে, তার

যোদ্ধাদের সামরিক অভিজ্ঞতা ও সামরিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের বিষয়টি বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ আমরা দেখছি যে, বৈরুত, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল ও বেক্কা প্রদেশের দূরদূরান্ত যেখানে হিযবুল্লাহর সদস্যরা থাকত ও তাদের মিসাইলের ঘাঁটি ছিল, যা ইসরাইলের বিমানগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে, এত কিছু সত্যেও হিযবুল্লাহ এখন লাগাতার ইসরাইলের দিকে মিসাইল নিক্ষেপ করার শক্তি অর্জন করেছে, যে কারণে ইসরাইল বাধ্য হয়েই ধীরেধীরে তার পদাতিক বাহিনী লেবাননে দাখিল করছে, তবে বিনতে জাবিল, মারুনুর রাস ও আইতারুনের তিন রাস্তা মোড়ে তাদেরকে কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে"।

মুহতাশিমির বর্ণনা মোতাবেক, লেবাননে হিযবুল্লাহর জন্ম থেকে ১০০-হাজারের অধিক শিয়া যুবক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, প্রত্যেক প্রশিক্ষণে ৩০০-যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করে, এখনও লেবানন ও ইরানে বহু প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে।[1]

---

[1] দেখুন: الشرق الأوسط তারিখ: ১১/৭/১৪২৭হি. মোতাবেক: ৫/৯/২০০৬ই., সংখ্যা: (১০১১২) আলী নূরী যাদাহ এর প্রবন্ধ থেকে। যার শিরোনাম ছিল এই যে, আলী আকবর মুহতাশিমী পূর, সিরিয়ায় নিযুক্ত ইরানের সাবেক রাষ্ট্রদুত ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বীকারোক্তি যে, "হিযবুল্লাহর যোদ্ধারা ইরানী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সাথে মিশে ইরাক যুদ্ধে এবং আহওয়ায এর ছাত্র অসন্তোষ দমনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল।"

হিযবুল্লাহর বয়ান ও রাজনীতিতে তাকিইয়া (আসল কথার বিপরীতে প্রকাশ্যে অন্য কথা বলে ধোকা দেওয়া) -এর ব্যবহার

আহলে-সুন্নার সাথে সবচেয়ে বেশী তাকিয়্যাহ নীতি ব্যবহার করে হিযবুল্লাহ। «الإمام المهدي ومفهوم الانتظار» গ্রন্থের ২৪০-নং পৃষ্ঠায় কাজেম মিসবাহ বলেন: “তাকিয়্যাহ নীতির আশ্রয় গ্রহণকারী বড় মুজাহিদ, সে সচেতন ও সতর্ক অবস্থায় জিহাদ করে, সে সম্ভাব্য সকল পন্থায় জিহাদ করে, সে হাত-পা বেঁধে বসে নেই, সে দীনি বিষয় ও দায়িত্ব থেকে গাফিল নয়, যেমন সরলমনা মানুষেরা মনে করে। তাকিয়্যাহ শুধু গোপন আমল নয় যে, শিয়াদের নির্দিষ্ট একটি গ্রুপ তার উপর আমল করবে, অথবা রাজনৈতিক কোনো দল তাকে লক্ষ্য হিসেবে নিবে, বরং এটা আমলের এক পদ্ধতি, যা যথাযথভাবে হিযবুল্লাহ বাস্তবায়ন করছে। তাকিয়্যাহ রাজনীতির দুর্দিন ও সুদিন সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য...” পরবর্তী পৃষ্ঠায় তিনি বলেন: “তবে কতক সময় খতিব ও মুবাল্লিগ বাধ্য হয়ে কথা গোপন করেন, স্পষ্টতা ত্যাগ করেন ও শব্দের নোকতা পরিহার করেন, কারণ এরূপ না করলে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা থাকে”।

কাজেম মিসবাহের কথায় যে চিন্তা করবে, তার বুঝতে দেরি হবে না যে, হিযবুল্লাহ স্বীয় ভাষণে তাকিয়্যাহর ব্যবহার করে।

হিযবুল্লাহর ঘরের লোক হাঁটে হাড়ি ভেঙ্গে দিল। এ জন্য আমরা

বারবার বলি: হিযবুল্লাহকে বিশ্বাস কর না, হাসান নাসরুল্লাহর কথা সত্য জেনো না, সে মিথ্যাবাদী। তাদের ধর্ম বাতেনি। তারা মুখে এক কথা বলে, কিন্তু অন্তরে তাদের আরেক উদ্দেশ্য থাকে। যেমন তাদের গুরু কাজেম মিসবাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন। কখনো তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলেন, হাসান নাসরুল্লাহ এ পদ্ধতি বেশী ব্যবহার করে। কখনো তারা কোনো বিষয় একেবারে এড়িয়ে যায়, যেন নিজের উপর কিংবা দলের উপর কোনো অপবাদ আরোপ না হয়।

পাঠকবর্গ, এতে অবাক হবেন না, কারণ দ্বাদশ ইমামিয়াদের ধর্ম তাকিয়্যাহর আড়ালে মিথ্যা বলার অনুমতি দেয়, বরং তাকিয়্যাহর পদ্ধতিতে আল্লাহর নামেও মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করে। « وسائل الشيعة » গ্রন্থের লেখক আবু আব্দুল্লাহ থেকে শ্রবণ করে বলেন: "কেউ যদি তাকিয়্যাহর আশ্রয় গ্রহণ করে মিথ্যা কসম করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, যদি সে বাধ্য ও অপারগ হয়" । ইমাম শাফে'ঈ রাহিমাহুল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন: "আমি রাফেযীদের চেয়ে কাউকে অধিক মিথ্যা কসমকারী পাইনি"।

হিযবুল্লাহ কি কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে?

হিযবুল্লাহ লেবাননে যুদ্ধ করতেই রাজি, সে কখনো লেবাননের সীমা অতিক্রম করে না, কখনো করবেও না। আকিদা যেরূপই হোক প্রত্যেক লেবাননির (খৃষ্টান, মারূনী, দুরযী, অথবা অন্য যে কোনো আকীদা অবলম্বীই হোক না কেন, তার) সাথে তাদের বন্ধুত্ব, যদি সে হিযবুল্লাহর লক্ষ্যের অনুসারী হয় বা তাদের সাথে একাত্ম প্রকাশ করে। অতএব যার আদর্শ এরূপ, তার আমল কখনো ইসলামি জিহাদ হতে পারে না, তার যুদ্ধ কখনো আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য নয়। আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল, কেউ গণিমতের সম্পদের জন্য জিহাদ করে, কেউ স্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য জিহাদ করে, কেউ তার অবস্থান জানানোর জন্য জিহাদ করে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদ করে]? তিনি বললেন:

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

"আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যে জিহাদ করে সেই আল্লাহর রাস্তায় [জিহাদ করে]" ।[1] ইবনে হাজার আল-

---

[1] বুখারি: (২৮১০), মুসলিম: (১৯০৪)

‘আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “এখানে আল্লাহর কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামের দিকে আল্লাহর আহ্বান”।[1]

আমরা দেখলাম, হিযবুল্লাহ যে দাওয়াতের জন্য যুদ্ধ করে তার নির্যাস হচ্ছে লেবাননের সীমানা। দ্বিতীয়ত রাফেযীদের আকিদা সমন্বিত করা। সে শুধু লেবাননের জমিনের জন্য যুদ্ধ করে না, বরং শিয়া আকিদা প্রতিষ্ঠিত করা ও শিয়া অঞ্চলে তার বাস্তবায়ন করাও তার উদ্দেশ্য । হিযবুল্লাহ যদি তার কাজকে জিহাদ গণ্য করে, তাহলে যখন আহমদ ইয়াসিন ও আব্দুল আযীয রানতিসিকে হত্যা করা হল, তখন কেন সে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, কেন একটি মিসাইল ইয়াহূদীদের দিকে নিক্ষেপ করেনি!!

অধিকৃত ফিলিস্তিন, যেখানে রয়েছে মুসলিমদের সর্বপ্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস, সেই পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার জিহাদের তুলনায় ইরান ও সিরিয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যুদ্ধ করাই অধিক উত্তম হিযবুল্লাহর নিকট?!

এই দেখুন হিযবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল হাসান নাসরুল্লাহ বলেন: “ইয়াহূদীদের সাথে তাদের যুদ্ধ আকিদাগত বিষয় নয়, দু’জন ইসরাইলি সৈনিক অপহরণ করার অপরাধে ইসরাইল যখন লেবাননের উপর ৩৪-দিন যুদ্ধের বাজার গরম রেখে লেবাননের

---

[1] দেখুন: ফাতহুল বারি: (৬/৩৪)

ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে, তখন হিযবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল হাসান নাসরুল্লাহ এক টিভি সাক্ষাতকারে বলে, যা ২৭/০৭/২০০৬ই. সালে লেবাননের New TV চ্যানেল প্রচার করেছে: “যদি জানতাম দু’জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করার ফলে লেবাননের এ পরিমাণ ক্ষতি হবে, তাহলে কখনো তার নির্দেশ দিতাম না। সে আরো বলে: দু’জন সৈন্য অপহরণ করার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে, হিযবুল্লাহ তার একভাগেরও আশঙ্কা করেনি। কারণ যুদ্ধের ইতিহাসে এ পরিমাণ ক্ষতি কখনো হয়নি। হাসান নাসরুল্লাহ আরো বলে: হিযবুল্লাহ দ্বিতীয়বার কখনো ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়াবে না”।[1]

এ ঘোষণার মাধ্যমে হাসান নাসরুল্লাহ প্রমাণ করল, সে জয়ী নয়, বরং পরাজয়ী। যারা হাসান নাসরুল্লাহকে বাহবা দেয় ও তাকে হিরো বানানোর চেষ্টা করে, তাদের গালে এটা বড় চপেটাঘাতও বটে।

এ হচ্ছে শিয়া মতবাদের নীতি, তার প্রত্যেক কাজ শুধু ব্যক্তি ও জাতি স্বার্থের জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য নয়, বরং তাদের স্বার্থের জন্য মুসলিম উম্মার স্বার্থ ধ্বংস করার প্রয়োজন হলে তাতেও তারা রাজি। তাই ড. আলি আব্দুল বাকি বলেছেন: “আমি দেখেছি

---

[1] দেখুন: الشرق الأوسط সংখ্যা: (১০১৩৫), তারিখ: ২৮/৮/২০০৬ই.

যে, শিয়াদের কর্মকাণ্ড হোক তা ইরানে অথবা ইরাকে অথবা আফগানিস্তানে অথবা যে কোনো জায়গায়, তা একমাত্র জাতিগত স্বার্থের জন্যই, মুসলিম উম্মাহর খিদমত ও তার স্বার্থ হাসিল কখনো উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংকীর্ণ জাতিগত, যদিও তা সমগ্র মুসলিম উম্মার বিপরীত হয়”।[1]

হিযবুল্লাহ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ

একটি জিজ্ঞাসা: হিযবুল্লাহ কি দখলকৃত কোনো ইসলামি রাষ্ট্র যেমন ফিলিস্তিন অথবা অধিকৃত অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন করার চেষ্টা করে কিংবা তার জন্য যুদ্ধ করে?

এ প্রশ্নের উত্তর: না, তারা কখনো মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করে না। শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়ার নিকট জিহাদ নেই, যাবত তাদের দ্বাদশ ইমাম[2] অদৃশ্য জগত থেকে বের না হয়। এটাই তাদের বিশ্বাস।

---

[1] দেখুন: ড. আলি আব্দুল বাকির প্রবন্ধ هل تكون حرب العصابات أملنا في هزيمة بني صهيون؟ ২১/৮/২০০৬ই. তারিখে যা موقع مفكرة الإسلام প্রকাশ করেছে।

[2] বস্তুত: তাদের দ্বাদশ ইমামের অস্তিত্বই নেই, কারণ তাদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারী অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেছেন। তার সন্তান হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। সুতরাং দ্বাদশ ইমাম বলে যাকে বলা হয় যে তিনি মুহাম্মাদ ইবন হাসান আসকারী, এমন লোক কখনও দুনিয়াতে আসেন নি। আর যেহেতু তিনি দুনিয়াতে আসেন নি সেহেতু তার গায়েব বা অদৃশ্য

তাদের কিতাবের ভাষা দেখুন: “ইমামের ঝাণ্ডার পূর্বে যে ঝাণ্ডাই উত্তোলন করা হবে, সেই ঝাণ্ডাধারী হবে তাগুত”। [1] অদৃশ্য জগত থেকে ইমাম বের হয়ে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাথে সন্ধি করবেন, আলে-দাউদের (ইয়াহূদীদের) বিধান মতে ফয়সালা করবেন, কাবা ধ্বংস করবেন, আহলে-সুন্নাহকে হত্যা করবেন, কারণ তারা শিয়া ইমামিয়াদের দুশমন। তাদের মৌলিক কিতাবসমূহের ভাষা এরূপ! আবু বকর ও ওমরকে বের করে তাদের শূলীতে চড়াবেন, অতঃপর তাদেরকে জ্বালিয়ে দিবেন।[2]

হিযবুল্লাহর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি নাঈম কাসেম এ সম্পর্কে বলেন:[3] “সামরিক যুদ্ধ যেহেতু শত্রুদের সাথে হয়, যা আমাদের এ

হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর যার অদৃশ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না তার আবার প্রকাশ হওয়ার কি আছে? বস্তুত ইমামিয়া শিয়ারা গাধা, তাদের উপর তাদের তথাকথিত পাগড়িধারী ধর্মীয় নেতারা মিথ্যাচার করে নেতৃত্ব করে যাচ্ছে। তারা মনে করছে এ তথাকথিত দ্বাদশ ইমাম লোকটি পাহাড়ে লুকিয়ে রয়েছে, তাই তারা পাহাড়ের পাদ-দেশে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ বলতে থাকে, “হে আমাদের মাওলা, তুমি বের হয়ে এস” এ জাতীয় হাস্যকর কর্মকাণ্ড কেবল রাফেযী ইমামী শিয়াদের মত গর্দভদের জন্যই উপযোগী। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। [সম্পাদক]

[1] দেখুন: كتاب الغيبة للنعماني (পৃ.৭০)

[2] দেখুন: আল-গায়বাহ লিন নুমানি।

[3] দেখুন: (حزب الله.. المنهج.. التجربة.. المستقبل) (পৃ.৫০)

কিতাবের মূল বিষয়, তাই বিষয়টি আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। ফকিহগণ জিহাদকে দু’ভাগে ভাগ করেছেন:

১. প্রাথমিক জিহাদ: যেমন মুসলিমরা অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল ও তাদের ভূমিতে প্রবেশ করল, যার সাথে অধিকৃত ভূমি পুনঃ উদ্ধার করা কিংবা কোনো জুলমের প্রতিশোধ গ্রহণের সম্পর্ক নেই, এটাকে প্রাথমিক জিহাদ বলা হয়। এ জাতীয় যুদ্ধ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা নিষ্পাপ ইমামের সাথে সম্পৃক্ত, এ জমানায় যেহেতু ইমাম মাহদি অদৃশ্য, তাই আমাদের উপর তা জরুরি নয়।

২. প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ: মুসলিমদের ভূমি যদি দখল দারি কিংবা উপনিবেশের স্বীকার হয়, তাহলে নিজের ভূমি ও স্বীয় জাতিকে রক্ষার স্বার্থে জিহাদ করা বৈধ, বরং ওয়াজিব”।

অতঃপর তিনি ৫১-নং পৃষ্ঠায় বলেন: “জ্ঞাতব্য যে, জিহাদের সিদ্ধান্ত নিবেন প্রধান নেতা ফকিহ [বর্তমান ইরানি সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা], তিনি প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের পরিস্থিতি চিন্তা করবেন। তিনিই প্রতিরোধের নীতি ও তার নিয়ম বাতলে দিবেন। কারণ রক্তের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ, জিহাদ জরুরি কি-না, কিংবা তার উদ্দেশ্য কি, ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দেওয়া কোনো প্রকার বৈধ নয়”।

অতএব আমাদের নিকট স্পষ্ট হল যে, হিযবুল্লাহ ও তার প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ টিভিতে যে শ্লোগান দেয়, যেখানে সে মসজিদে আকসা ও তার পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, যেমন সে বলে: ‘হে আকসা আমরা আসছি’, অথবা বলে: ‘চলো চলো কুদস চলো’ ইত্যাদির তার ভ্যালকিবাজি ও সর্বৈব মিথ্যা। এ কথার প্রমাণ খোদ হাসান নাস রুল্লাহর বাণী, কোনো এক সাক্ষাতকারে তার নিকট ফিলিস্তিন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তখন সে ফিলিস্তিনিদের বলে: “যখন তোমরা আমাদের প্রয়োজন বোধ করবে, আমরা তোমাদের সাথে আছি, এটাই যথেষ্ট”! কারণ, দ্বাদশ ইমামিয়ার আকিদা হচ্ছে, অদৃশ্য ইমামের আগমনের আগে কোনো জিহাদ নেই।

পাঠক লক্ষ্য করুন, তাদের নিকট আত্মরক্ষার জিহাদও নেই, যদি ক্ষমতার কেন্দ্র ফকিহ (খোমেনি/খামেনী) তার অনুমোদন না দেয়! সুতরাং হিযবুল্লাহর কোনো সদস্য কোনো কর্মকাণ্ডই করার ক্ষমতা রাখে না যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় ফকীহ (খামেনী) সেটার অনুমতি না দেয়। অতঃপর সামনের বর্ণনাগুলো দেখুন, তাহলে জানতে পারবেন রাফেযী কাকে বলা হয়, তারা সত্যিই কি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে?

আবু আব্দুল্লাহ আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমাদের আহলে বাইত থেকে কেউ বের হয়নি, হবেও না,

যতক্ষণ না মাহদি জুলম প্রতিহত অথবা কোনো হক উদ্ধারের জন্য বের হবেন, এর ব্যতিক্রম হলে অবশ্যই তাকে খেসারত দিতে হবে, তার যুদ্ধ আমাদের প্রতি ও আমাদের দলের প্রতি মানুষের বিদ্বেষকে বাড়িয়ে দিবে”।[1]

২০০০ই. সালে ‘বিনতে জাবিল’ এলাকা হতে ইসরাইলিদের হটে যাওয়ার পর হাসান নাসরুল্লাহ ১০০-হাজার দক্ষিনাঞ্চলীয় যোদ্ধার সামনে ঘোষণা দেন যে, হিযবুল্লাহ কখনো কুদসকে মুক্ত করার জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না![2]

একই সূত্রে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাসান রুহানি বলেন: “দক্ষিণ লেবাননের শাব‘আ কৃষি ভূমি হতে ইসরাইলের চলে যাওয়ার পর হিযবুল্লাহর প্রতিরোধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার কোনো বৈধতা নেই। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেন: হিযবুল্লাহর প্রতিরোধ শুধু লেবাননি ভূমির জন্যই নির্দিষ্ট”।[3]

---

[1] দেখুন: الصحيفة السجادية الكاملة (পৃ.১৬)

[2] দেখুন: সংখ্যা: (৮৬৩০), তারিখ: ২৭/৫/২০০০ই. **214** حزب الله رؤية مغايرة থেকে সংগৃহীত।

[3] দেখুন: الحياة اللندنية। ম্যাগাজিনে দেওয়া হাসান রুহানির সাক্ষাতকার, তারিখ: ১৮/১/২০০৪ই.

আমাদের প্রশ্ন: ফিলিস্তিনের বিষয়টি কোথায়, হিযবুল্লাহ যা দখলদার ইয়াহূদীদের থেকে মুক্ত করার ঘোষণা দেয়! অতএব শিয়া মতবাদে এমন কোনো পরিকল্পনা নেই, যার মধ্যে অধিকৃত ভূমি মুক্ত করা কিংবা দখলদার প্রতিরোধ করার কথা রয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদীনাজাদ বলেছে: “ইরান কোনো বহিঃরাষ্ট্রের জন্য হুমকি নয়, এমন কি ইয়াহূদী রাষ্ট্রের জন্যও নয়!![1]

---

[1] দেখুন: الشرق الأوسط সংখ্যা: (১০১৩৪), তারিখ: ২৭/৮/২০০৬ই. অপর সংখ্যা: (১০১৩৬), তারিখ: ২৯/৮/২০০৬ই. আরো দেখুন وكالات الأنباء العالمية এ তারিখে।

হিযবুল্লাহ ও ইসরাইলের মধ্যে গোপন চুক্তি

ইসরাইলের গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন: “ইসরাইল ও লেবাননি শিয়াদের মাঝে নিরাপত্তাপূর্ণ অঞ্চলের কোনো শর্ত নেই। তাই ইসরাইল শিয়াদের স্বার্থের প্রতি যত্নশীল, সেখানে অবস্থানরত ফিলিস্তিনি, যারা মূলত হামাস বা জিহাদ এর সদস্য, তাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করা বিষয়ে হিযবুল্লাহর সাথে ইসরাইলের এক ধরণে চুক্তি হয়ে গেছে”।[1]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, লেবাননি হিযবুল্লাহ ও ইসরাইলের মাঝে গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা স্বীকার করেছে হিযবুল্লাহর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল সুবহি তুফাইলি [2], তিনি বলেন: “নিশ্চয় হিযবুল্লাহ ইসরাইলের বর্ডার পাহারাদার”।[3]

---

[1] দেখুন: معاريف اليهودية তারিখ: ৮/৯/১৯৯৭ই.

[2] সুবহি তুফাইলি হিযবুল্লাহর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিল, যখন সে দেখল যে, হিযবুল্লাহ প্রতিরোধ ত্যাগ করে সিরিয়ান ও ইরানি স্বার্থের শুধু সেবক হয়নি, বরং ইসরাইলি উত্তর প্রান্তের সীমানার নিরাপত্তা প্রহরীও বনে গেছে, আর কোনো মুজাহিদ ইসরাইলে হামলা করার চেষ্টা করলে তাকে তারা বাঁধা দেয় ও গ্রেফতার করে। তখন তিনি হিযবুল্লাহ থেকে পৃথক হয়ে যান।

[3] দেখুন: الشرق الأوسط তারিখ: ২৯-রজব ১৪২৪হি. মোতাবেক: ২৫/ ৯/ ২০০৩ই. সংখ্যা: (৯০৬৭), আরো দেখুন: new tv পরিচালিত «بلارقيب» প্রোগ্রাম, ২০০৩ই. সালের শেষের দিকে।

সুবহি তুফাইলি আরো বলেন: “নব্বইয়ে দশকে ইরানের রাজনৈতিক ময়দানে ব্যাপক পরিবর্তন আরম্ভ হয়, প্রথমবার হয় জুলাই ১৯৯৩ই. সালে, অতঃপর হয় এপ্রিল ১৯৯৬ই. সালে। তখন ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত হয় যে, ইয়াহূদীরা ফিলিস্তিনে নির্বিঘ্নে বাস করতে পারবে। তখন থেকে ইয়াহূদীরা লেবাননে অবস্থিত তাদের সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করা আরম্ভ করে, কারণ এ সমঝোতায় সিদ্ধান্ত হয় যে ফিলিস্তিনি জিহাদি গ্রুপগুলো নিঃশেষ করা হবে, আর হিযবুল্লাহ লেবাননের সীমান্তে অবস্থান করবে।

অতঃপর তিনি বলেন: আমি বলতে চাই যে, এপ্রিলের সমঝোতার ভিত্তিতে (ইসলামি) প্রতিরোধ আন্দোলন (হিযবুল্লাহ) মূলত সীমান্ত প্রহরী বনে গেছে।[1]

তাই ইসরাইল দক্ষিণ লেবাননে শিয়াদের স্বার্থ সুরক্ষার জিম্মাদার, যেন তারা ইসরাইলের উপর আক্রমণকারীদের [সুন্নিদের] প্রতিরোধ করে ইসরাইলের উত্তর সীমান্তকে হিফাজত করে।

২৩/৫/১৯৮৫ই. তারিখে ‘জেরুজালেম পোস্ট’ পত্রিকায় এসেছে: দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের স্বার্থ ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, যা হিযবুল্লাহ ও ইসরাইলের উপর নির্ভরশীল। অত্র এলাকাকে

---

[1] দেখুন: new tv পরিচালিত «بلا رقيب» প্রোগ্রামে তার সাক্ষাতকার, যা ২০০৩ই. সালের শেষের দিকে সম্প্রচার করা হয়েছে।

অবশ্যই ইসরাইল বিরোধী যে কোনো আশঙ্কা থেকে মুক্ত করা জরুরি... এখন সময় এসেছে, ‘আমাল’ সংগঠনের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করার এটাই ইসরাইলের মোক্ষম সময়।[1]

এ কথার স্বীকৃতি স্বরূপ তাওফিক মাদিনি বলেন: “আমাল সংগঠন’ দায়িত্বে নিয়েছে যে, দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে যারা ইসরাইলে সশস্ত্র হামলার জন্য অগ্রসর হবে, কিংবা ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনের উত্তর সীমান্তে স্থাপিত ইসরাইলি কলোনীতে হামলা করবে, তাদেরকে তারা (শিয়ারা) প্রতিরোধ করবে”।[2]

এ বিষয়টি হিযবুল্লাহর সাবেক আমির সুবহি তুফাইলিও স্বীকার করেছেন, যেমন তিনি বলেন: “হিযবুল্লাহ ইসরাইলি সীমান্তের প্রহরী বনে গেছে। এ কথার সত্যতা যে যাচাই করতে চায়, সে যেন অস্ত্র হাতে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয় এবং ইয়াহূদী শত্রুদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে অবশ্যই দেখা যাবে যে, হিযবুল্লাহ কিভাবে সশস্ত্র যোদ্ধাদের প্রতিহত করে!

কারণ, যারা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা এখন জেলেখানায় বন্দি। হিযবুল্লাহ যোদ্ধারা তাদেরকে বন্দি করেছে”।[3]

---

[1] দেখুন: أمل والمخيّمات الفلسطينية» (পৃ.১৬২)

[2] দেখুন: «أمل وحزب الله في حلبة المجابهات» (পৃ.৮৩)

[3] দেখুন: new tv পরিচালিত «بلا رقيب» প্রোগ্রামে তার সাক্ষাতকার, যা ২০০৩ই. সালের শেষের দিকে সম্প্রচার করা হয়।

“হিযবুল্লাহর উপর ইসরাইলের হামলা না করার কারণ তার শক্তি ও সামরিক বল নয়, তার পশ্চাতে মূল কারণ হচ্ছে হিযবুল্লাহ যদি দক্ষিণ লেবানন থেকে সরে যায়, তাহলে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে সুন্নিরা, যা ইসরাইল কখনো চায় না। ইসরাইল-হিযবুল্লাহ সম্পর্কের সুন্দর ব্যাখ্যা: “ইসরাইলের স্বার্থ হচ্ছে হিযবুল্লাহর টিকে থাকা এবং হিযবুল্লাহর স্বার্থ হচ্ছে ইসরাইলের টিকে থাকা”।

[তবে, এ কথাও ঠিক যে, হিযবুল্লাহ একটি সুগঠিত দল এবং তার সাথে মাঝে-সাজে ইসরাইলের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। যা সাধারণত যে কোনো দু’টি ক্ষমতাধর কাছাকাছি থাকলে ঘটেই থাকে।]

সুতরা শিয়াদের কর্মকাণ্ড, যদিও কোনো কোনো সময় ইয়াহূদী-আমেরিকান স্বার্থের জন্য মাথা   ব্যথার কারণ হয়, তবুও এটি একটি মজবুত সুশৃংখল প্রজেক্ট; যা উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা কিংবা সমঝোতাকে অস্বীকার করে না। বরং কখনও কখনও তা সহেযাগিতার প্রতিই বেশি ধাবিত হতে দেখা যায়। যেমনটি ইরান কর্তৃক ঘটেছে ইরাক ও আফগানিস্তানের ব্যাপারে (শিয়ারা সেখানে) আমেরিকাকে সাহায্য করেছে । অনুরূপ দক্ষিণ লেবানন থেকে সুন্নী মুজাহিদদের হটাতে ইসরাইলকে সাহায্য করেছে হিযবুল্লাহ।

তবে এটি সবচেয়ে সত্য যে,   সুন্নিদের কর্মকাণ্ড আমেরিকা-ইসরাইলের জন্য অসহ্যকর, তাই সেখানে তাদের সাথে

সহযোগিতা বা সমঝোতা অথবা দরকষাকষির বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। তার উদাহরণ অনেক, প্রথম উদাহরণ আফগানিস্তানের তালেবান এবং শেষ উদাহরণ ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ, তাদের উভয়ের মাঝে তৃতীয় উদাহরণ হল ইরাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী সুন্নিরা। আমেরিকা ও ইসরাইল তাদেরকে বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়, কারণ সুন্নিরা নাকে খত দিয়ে কোনো বিষয় মেনে নিতে রাজি নয়, তাই শিয়ারা ইরাক, আফগানিস্তান ও ইসরাইল যেখানে সুযোগ পেয়েছে আমেরিকা ও ইসরাইলের হয়ে সুন্নিদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।[1]

---

[1] দেখুন: مفكرة الإسلام ওয়েব সাইটে ‘ওলিদ নুর’ এর الوعد الصادق ينتهي بوهمٍ كاذب প্রবন্ধ, তারিখ: ১৭/৮/২০০৬ই. আরো দেখুন: রাবি‘ আল-হাফেয এর حزب الله والمساحات الخالية প্রবন্ধ: مفكرة الإسلام ওয়েব সাইটে, তারিখ: ২৬/৮/২০০৬ই.

হিযবুল্লাহ কার বন্ধু ?

এতে সন্দেহ নই যে, শিয়া রাফেযী হিযবুল্লাহর প্রথম বন্ধুত্ব ইরান, দ্বিতীয় বন্ধু সমাজতান্ত্রিক শাসক সিরিয়ার নুসাইরিগণ। «الراصد» ম্যাগাজিনে ولاء الشيعة لمن “শিয়াদের বন্ধুত্ব কার জন্য”? শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে, তাতে লেখক[1] বলেন:

১. খোমেনি শাসনের ছায়াতলে সকল শিয়াকে একত্র করার জন্য ইরান হিযবুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করে। হিযবুল্লাহর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল নায়িম কাসেম বলেন: “মুমিনদের একটি দলের অন্তরে বিলায়াতুল ফকিহ থিউরিকে বাস্তব রূপ দেওয়া এবং সকল মুসলিম উম্মাহকে তার অধীনে সমবেত করা জরুরি, যার থেকে কোনো দেশ ও সম্প্রদায় যেন বাদ না থাকে। এ থিউরি নিয়ে লেবানন থেকে নয় সদস্যের একটি জামাত খোমেনির নিকট ইরান গমন করেন এবং তারা হিযবুল্লাহ নামের সংগঠন প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা পেশ করেন, খোমেনি তাদেরকে সমর্থন করেন ও তাদের জন্য বরকতের দোয়া করেন”।[2]

---

[1] দেখুন: الراصد ম্যাগাজিন, সংখ্যা: (৩৪), রবিউস সানি: ১৪২৭হি. আমরা সেখান থেকে হিযবুল্লাহ সংক্রান্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করেছি। আপনি পূর্ণ প্রবন্ধটি দেখার জন্য http://www.alrased.net ওয়েব সাইট ব্রাউজ করুন।

[2] দেখুন: আমিন মুস্তফা রচিত, المقاومة في لبنان (পৃ.৪২৫), দারুল হাদি থেকে

২. ১৪/৮/১৯৯৫ই. তারিখে «الشراع» ম্যাগাজিন ড. গাসসান ইজ্জির রচিত حزب الله (পৃ.৩৪) গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ করে : হিযবুল্লাহর নেতৃত্বে দু’জন ইরানি সদস্য রয়েছে!

৩. হাসান নাসরুল্লাহ হিযবুল্লাহর প্রধান এবং লেবাননে শিয়া নেতৃবৃন্দের একজন হওয়া সত্যেও কিভাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির প্রতিনিধি হন। একাধিক ছবিতে প্রকাশ যে, হাসান নাসরুল্লাহ লেবাননের অপর নেতা মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লার উপস্থিতিতে খামেনির হাতে চুমু খাচ্ছেন।

যদি লেবানন ও ইরান যুদ্ধ বাঁধে, যার পূর্বাভাস বর্তমান আকাশে দেখা যাচ্ছে, তাহলে নাসরুল্লাহ এবং তার পশ্চাতে হিযবুল্লাহ ও শিয়ারা কার পক্ষাবলম্বন করবে, লেবানন না ইরান?

৪. পূর্বে দেখেছি, যখন ‘হরকতে আমাল’ ও হিযবুল্লাহর নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাত বেঁধেছে, তারা ইরান থেকে ফয়সালা নিয়েছে।[1]

৫. ‘হরকতে আমাল’ ১৯৮২ই. সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ৪র্থ সম্মেলনে ঘোষণা করে: ‘আমাল’ ইরানি ইসলামি বিপ্লবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।[2]

প্রকাশিত।

[1] দেখুন: রচিত دولة حزب الله (পৃ.১১৯)

[2] দেখুন: রচিত دولة حزب الله (পৃ.১১৯)

৬. হিযবুল্লাহ খোমেনির ‘বিলায়াতুল ফকিহ’ থিউরির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ইরানি গবেষক ড. মাসউদ আসাদ আল্লাহি স্বীয় রচনা« الإسلاميون في مجتمع تعددي» গ্রন্থে (পৃ.৩২১) বলেন: “বিলাওয়াতুল ফকিহ হিসেবে খোমেনির নেতৃত্ব নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অথবা নির্দিষ্ট সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়, সুতরাং এ নেতৃত্ব বাস্তবায়নের পথে যে কোনো বাধা বা সীমানা নির্ধারণ অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। তাই লেবাননের হিযবুল্লাহ বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত হিযবুল্লাহর অংশ হয়ে কাজ করছে... এসব মন্তব্য থেকে প্রকাশ পায় যে, হিযবুল্লাহ ওলীয়ে ফকীহ (খোমেনী/খামেনী) বা ইরানের যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত”।

মুসলিম বিশ্বের আহলে-সুন্নাহ ওহিযবুল্লাহর সম্পর্ক

আমরা পূর্বে বলেছি, হিযবুল্লাহ আহলে-সুন্নাহর সাথে তাকিয়্যাহর আড়ালে কাজ করে। মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে সে পুষ্পময় বক্তৃতা প্রদান করে, তার বক্তৃতায় ফিলিস্তিন ও মসজিদে আকসা মুক্ত করার শ্লোগান থাকে, যেন শ্রোতাগণ মনে করেন: তারা ইয়াহূদী অধিকৃত মুসলিম ভূমি উদ্ধারের জন্য আজই রওয়ানা করছে। তাদের এ বক্তৃতায় হামাস ও জিহাদে ইসলামির অনেক নেতা ধোঁকা খেয়েছেন। ফিলিস্তিন মুক্ত করার দাবিতে কেউ হিযবুল্লাহর সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেও ইরানের সাথে সম্পৃক্ত হিযবুল্লাহ কখনো তাকে গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না আরো নিচে না নামে, যেমন খোমেনির প্রশংসা করা, অথবা ইরানি সরকারের প্রশংসা করা, তবেই প্রতারিত আহলে-সুন্নাহ হয়তো 'হিযবুল্লাহ লেবানন' থেকে বাহ্যত উপকার হাসিলে সক্ষম হবে। হিযবুল্লাহ লেবানন ব্যতীত অন্য কোনো দেশে থেকে শিয়া ছাড়া কাউকে গ্রহণ করে না, যেমন তার ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ইরান, ইরাক ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের শিয়াগণ। আর কতক আহলে-সুন্নাহও তাদের বন্ধু, যারা রাফেযীদের ইতিহাস ও আহলে-সুন্নাহর ব্যাপারে তাদের আকিদা জানে না। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।

হিযবুল্লাহর যাঁতাকলে পিষ্ট লেবাননি মুসলিমরা কেমন আছেন?

লেবাননের আহলে সুন্নাত তথা সুন্নীরা জুলুম ও কোণঠাসার জীবন অতিবাহিত করছেন। বিশেষ করে রাফেযী ও নুসাইরিদের কারণে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ‘আহবাশ’ সম্প্রদায়কে উসকে দেয় ও তাদেরকে সাহায্য করে। ‘আহবাশ’দের ধর্ম হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাদের ধর্মে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এ দিকে ইরানি মদদপুষ্ট হিযবুল্লাহ রাফেযী তো তাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছেই। রাফেযী, আহবাশ ও নুসাইরিরা হাজার হাজার কিতাব ফ্রি বণ্টন করে, যাতে তাদের আকিদা ও ধর্মের দাওয়াত রয়েছে, অথচ আহলে সুন্নাহ নিজেদের ঈমান-আকিদা সুরক্ষার জন্য কিতাব ছাপাতেও ভয় পায়, যার মাধ্যমে তারা অন্যদের উত্তর দিবে। তারা জেলের ভয় করে, বিশেষ করে যদি তাদের কিতাবে রাফেযী আকিদার প্রতিবাদ থাকে, হোক তা ইংগিতে, যেমন « لله ثم للتاريخ» “আল্লাহর জন্য অতঃপর ইতিহাসের জন্য” কিতাবের ক্ষেত্রে ঘটেছে। প্রকাশককে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছে, আর যাবতীয় কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অনুরূপ ঘটেছে আলুসি রচিত « صب العذاب على من سبَّ الأصحاب» কিতাব প্রকাশকের ক্ষেত্রে। ছাপাখানার মালিককে বলে দেওয়া হয়েছে, যদি দ্বিতীয়বার এ কিতাব ছাপানো হয়, তাহলে তারা ছাপাখানা জ্বালিয়ে দিবে। লেবাননে আহলে সুন্নাহর অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে, তারা বলির

পাঁঠা, কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বোমা বাজি অথবা যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটুক, তার জন্য আহলে সুন্নাহকে দায়ী করা হয়, বরং কখনো অপ্রমাণিত ঘটনার কারণে বছরের পর তাদেরকে জেলে রাখা হয়। লেবাননে এখন এরূপই ঘটছে, আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী।

জাবালে লেবানন প্রদেশের মুফতি ড. মুহাম্মদ আলি জুজু « فجر الإسلام» [‘ফাজরুল ইসলাম’] ম্যাগাজিনে আল্লাহর নিকট আহলে সুন্নাহর উপর হিযবুল্লাহর জুলম ও অত্যাচারের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, শিয়ারা আহলে সুন্নাহর মসজিদ পর্যন্ত দখল করে নিচ্ছে। দক্ষিণ লেবাননে হিযবুল্লাহর আধিপত্য উল্লেখ করে বলেন: “তাদের আধিপত্যের কারণে হিযবুল্লাহর কতক যুবক দক্ষিণ লেবানন ও জাবালে লেবাননের অঞ্চলসমূহে আহলে-সুন্নাহর মসজিদ পর্যন্ত দখল করে নিচ্ছে। এ ঘটনা বারবার ঘটছে। সর্বশেষ ‘জিয়াহ’ নামক স্থানে নবী ইউনুসের মসজিদের উপর তারা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। ‘জিয়াহ’ প্রদেশে হিযবুল্লাহ ও আমাল উভয় মিলে শায়খ আব্দুল আমির কিবলানের নেতৃত্বে আহলে সুন্নাহর ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করছে। শিয়াদের সর্বোচ্চ পরিষদ ‘জিয়াহ’ নামক স্থানে শিয়াদের ওয়াকফ জমির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। অতঃপর এ কমিটি বৈরুতে অবস্থিত সুন্নী মুসলিমদের ওয়াকফ সংক্রান্ত অফিসে দাবি

উত্থাপন করেছে যে, ‘জিয়াহ’ নামক স্থানের ওয়াকফ জমিতে তাদেরও হক রয়েছে। সমুদ্র তীরে অবস্থিত এ জমি চৌদ্দ হাজার বর্গ মিটার ব্যাপ্তি। তাতে একটি মসজিদ, যার নাম মসজিদে ইউনুস, একটি সরকারি মাদ্রাসা, একটি হাই স্কুল এবং কবরস্থান ইত্যাদি রয়েছে।

বর্তমান বিষয়টি লেবাননের আদালতে বিচারাধীন, এ জমিনে একটি সাইন বোর্ডও টাঙ্গিয়ে দিয়েছে তারা। এ সাইন বোর্ডের আড়ালে শিয়া পরিষদের সদস্যরা আহলে সুন্নাহকে তাদের মসজিদ ও ওয়াকফ সম্পত্তিতে সুখে থাকতে দিচ্ছে না। আহলে সুন্নাহ নতুন করে মসজিদ সংস্কার ও মেরামতের কাজে হাত দিয়েছে, কিন্তু তারা মসজিদ খারাপ করছে মর্মে আদালতের গোচরে বিষয়টি নিয়ে যায় এবং তারা মসজিদের কাজের উপর স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে।

এভাবে তারা সাধারণ বিষয়কে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে পরিণত করে, মসজিদের ছাদের উপর মাইক রেখে তারা আহলে সুন্নাহকে উসকানি দেয়। তারা সেখান থেকে নিজস্ব আজান প্রকাশ করে, যার মধ্যে (وأن علياً بالحق ولي الله) শব্দও রয়েছে। এ শহরে এটাই প্রথম ঘটনা। তারা ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের ধারে না গিয়ে মারকাজে ইফতা ও আওকাফকে পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে। তারা খুব খারাপ ভাষায় গালি-গালাজ করে, বাজারি শব্দে তাদের অন্তরের

হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার করে, যেন মুসলিমদের উসকে দেওয়া যায় এবং তাদের মাঝে ফেতনার সৃষ্টি হয়।

এ ঝগড়া মিটানোর জন্য একাধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রচেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন, কারণ শিয়া সংগঠনসমূহ, যার পশ্চাতে রয়েছে হিযবুল্লাহ, আমাল ও শিয়াদের সর্বোচ্চ পরিষদ শায়খ আব্দুল আমির কিবলানের নেতৃত্বে তারা আস্তে আস্তে আহলে সুন্নাহ অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে, ইতিহাস বিকৃতি করছে, যেন 'জিয়াহ'র যুবকদের মাঝে হট্টগোল বেঁধে যায়।

এতে সন্দেহ নেই যে, 'সুন্নী ইসলামি ওয়াকফে'র নেতৃবৃন্দের নিকট জমিনের সকল দলিল ও ঐতিহাসিক কাগজ-পত্র বিদ্যমান, যা প্রমাণ করে 'জিয়াহ' নামক স্থানের নবী ইউনুসের ওয়াকফের কর্তৃত্বের হকদার তারাই। কিন্তু তারা চাচ্ছে কারণে বা অকারণে যেভাবে হোক আহলে সুন্নাহ ও হিযবুল্লাহর মাঝে যুদ্ধ বেধে যাক"![1]

লেবাননে আহলে সুন্নাহর মসজিদ দখলে তারা পায়তারা করছে, কোনটিতে তারা সফলও হয়েছে। শুধু 'জিয়াহ'র মসজিদই নয়, বালাবাক্কায় তারা الظاهر بيبرس 'যাহের বিবরস' মসজিদকেও দখল

---

[1] দেখুন: فجر الإسلام ম্যাগাজিনে জাবালে লেবাননের মুফতি মুহাম্মাদ আলি জুযুর সাক্ষাতকার।

করে নিয়েছে, প্রথমে তারা মসজিদের সংস্কার কাজ বন্ধ করে, পরবর্তীতে তার নাম দেয় مسجد رأس الحسين রা'সুল হুসাইন মসজিদ। অনুরূপ 'মাশুক' প্রদেশে 'রুউর' নামক স্থানের নিকট মসজিদে আলি ইবনে আবি তালিবের উপর তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, তার নাম দিয়েছে তারা الوحدة الإسلامية মসজিদ, অনুরূপ 'সুউর' নামক স্থানের নিকটবর্তী শাবরিহা মসজিদের উপর তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়, তার নাম দিয়েছে তারা মসজিদ কাজেম। তবে 'সুউর' এর পুরনো মসজিদ, যার নাম মসজিদ ফারুক ওমর, তার ব্যাপারেও তারা বারবার বলছে মসজিদটি শিয়াদের ছিল, খিলাফতে উসমানিয়ার সময় এটা তারা দখল করে নিয়েছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, এটাও তারা ভবিষ্যতে দখল করার পরিকল্পনা করছে!

বিভিন্নভাবে বুঝা যায় যে, তারা লেবাননের প্রধান প্রধান শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সেগুলোকে সুন্নী থেকে শিয়া শহরে পরিণত করার লক্ষ্যে ঘৃণ্য ও জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এক শতাব্দীরও কম সময়ে তারা 'সুউর' শহরে আধিপত্য বিস্তারে সফল হয়েছে, এখন অন্যান্য শহরে এরূপ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে, যেমন সায়দা ও বৈরুত ইত্যাদি।

আমরা আরো বলতে চাই যে, আরব লীগ ও অন্যান্য সংগঠনের চোখ-কানের উপর সিরিয়ার সরকার লেবাননে আহলে সুন্নাহকে

ক্ষমতাহীন করার পায়তারা করছে, অথচ তারা ঘাড়ের উপর হাত রেখে বসে আছে। সিরিয়া শিয়াদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা শক্তিশালী করছে। ইতিপূর্বে তারা লাগাতার আহলে-সুন্নাহকে হত্যা করেছে, যার শুরু হচ্ছে ফিলিস্তিনি থেকে। তাদেরকে তারা নির্দিষ্ট শিবিরে জীবন-যাপন করতে বাধ্য করছে। তারা হারকাতুল মুরাবেতিন ও হারাকাতুত তাওহীদকে নিঃশেষ করেছে এবং জামাতে ইসলামিকে ধ্বংস করে দিয়েছে আর তাকে সশস্ত্র সংগঠন থেকে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করেছে।

তারপর কি?

হিযবুল্লাহ লেবাননে আহলে সুন্নাহর মসজিদ দখল করছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের অনেক গাফেল ভাই হিযবুল্লাহর বিজয়ে খুশি হয়, তাদের বিজয়কে ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় গণ্য করে। জ্ঞানের এসব ভিখারিরা জানে না, হিযবুল্লাহ মুসলিম দেশসমূহে ইরানি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায়। লেবাননি হিযবুল্লাহ ইরানের জন্য আরব রাষ্ট্রসমূহে প্রবেশ করার একটি চোরা পথ। হিযবুল্লাহকে অর্থ সাহায্য তাদের ইরানী নেতৃত্ব ছাড়া আর কে প্রদান করে?

লেবানন ও অন্যান্য ইসলামি সরকার প্রসঙ্গে হিযবুল্লাহর অবস্থান

মুহাম্মদ নুমানি রচিত “আল-গায়বাহ”: (পৃ.৭২) কিতাবে এসেছে: মালিক জুহানি থেকে বর্ণিত, আবু জাফর বাকের ‘আলাইহিস সালাম বলেছেন: “কায়েম (মাহদি) এর পূর্বে যেসব ঝাণ্ডা উড্ডীন হবে, প্রত্যেক ঝাণ্ডাদার হবে তাগুত”।

মাজলিসি রচিত “বিহারুল আনওয়ার”: (খ.৫৩, পৃ.৮) গ্রন্থে এসেছে: সাদেক ‘আলাইহিস সালাম বলেছেন: “হে মুফাদদাল, কায়েম (মাহদি) এর প্রকাশ্যে আসার পূর্বে যত বায়আত হবে, প্রত্যেক বায়আত হবে কুফরি, নিফাক ও ধোঁকা, আল্লাহ তা ‘আলা বায়আতকারী ও বায়আত গ্রহণকারী উভয়কে লানত করুন”।

অতএব হিযবুল্লাহ গোষ্ঠী ‘দ্বাদশ ইমামিয়া শিয়া সরকার’ ব্যতীত কোনো সরকারের আনুগত্যকে জরুরি মনে করে না, তবে তাকিয়্যাহর আশ্রয়ে তারা অন্যান্য সরকারের কথা শোনে ও তাদের আনুগত্য করে”।

হুর আমেলি রচিত “অসায়েলুস শিয়াহ”: (১১/৪৬২) গ্রন্থে এসেছে, আবু আব্দুল্লাহ ‘আলাইহিস সালাম তার সাথীদের বলেন: “আহলে বাতেলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, তাদের কষ্ট বরদাশত কর, খবরদার তাদের গালমন্দ করবে না, তোমাদের ও তাদের মাঝে কোনো বিষয় যৌথ হলে এবং তোমরা তাদের সাথে একত্র উঠা-বসা ও কথাবার্তায় লিপ্ত হলে তোমরা তোমাদের দীনের উপর

আমল কর, কারণ তাদের সাথে বসা, একত্র থাকা ও কথাবার্তায় তোমাদের তাকিয়্যাহর আশ্রয় নেওয়া জরুরি, যার নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন"।

হুর আমেলি বলেন, "অধ্যায়: জনসাধারণের সাথে তাকিয়্যাহর আশ্রয় নেওয়া ওয়াজিব": আবু বাসির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু জাফর বলেছেন: "যখন বাচ্চাদের ন্যায় রাষ্ট্র কায়েম হয়, তখন পাবলিকের সাথে বাহ্যিকভাবে মিল রাখ ও অভ্যন্তরীণভাবে তাদের বিরোধিতা কর"।[1]

হুর আমেলি রচিত "অসায়েলুস শিয়াহ": (১১/৪৭১) গ্রন্থে আরো এসেছে: "অধ্যায়: তাকিয়্যাহর ভিত্তিতে সরকারের আনুগত্য করা ওয়াজিব"। এ প্রসঙ্গে তিনি একাধিক হাদিস![2] বর্ণনা করেন, সরকারের সাথে তাকিয়্যাহর আশ্রয় নেওয়া এবং তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখা ওয়াজিব।

শিয়াদের কেন্দ্রীয় আলেম (রিসোর্স পার্সন) মুহাম্মদ হুসাইন ফাদলুল্লাহ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন: "অতীতে যারা ইসলামের নামে শাসন করেছে, আমরা বিশ্বাস করি না তারা ইসলাম

---

[1] "অসায়েলুস শিয়াহ": (১১/৪৭০-৪৭১)

[2] হাদীস বলে এখানে রাসূলের হাদীস বোঝানো হয়নি। কারণ, শিয়ারা রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয় না। তাদের ইমামদের উপর মিথ্যাচার করে যা লেখা হয়েছে সেটাকেই তারা হাদীস বলে থাকে। [সম্পাদক]

অনুযায়ী শাসন করেছে। উদাহরণত আমরা বিশ্বাস করি না উসমানি খিলাফত ইনসাফপূর্ণ, স্বাধীন ও ইসলামি ছিল”।[1]

আরব উপসাগরীয় দেশে হিযবুল্লাহর শাখার বর্ণনায় আমরা পূর্বে উল্লেখ করছি, হিযবুল্লাহ ও তার শাখাসমূহ তাদের সরকারের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে, তাদের দৃষ্টিতে সরকারগুলো তাগুত, তাদেরকে পদচ্যুত করে ইরানি সরকারের আদলে শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করা ওয়াজিব।

---

[1] দেখুন: الإسلام والكونجرس الأمريكي আহমদ খিদির এর প্রবন্ধ, مجلة المجتمع ম্যাগাজিন, সংখ্যা: (৯৫৩), (পৃ.৪৫)

মুসলিমরা কেন হিযবুল্লাহ প্রসঙ্গে ধোঁকা লিপ্ত?

আমি বিশ্বাস করি, বেশ কয়েকটি কারণে আহলে সুন্নাহ হিযবুল্লাহ দ্বারা ধোঁকা খায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. অনেক আহলে-সুন্নাহ শিয়া রাফেযীদের আকিদা ও ইমামদের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে জানে না। আহলে-সুন্নাহ জানে না, তারা কুরআনে বিকৃতিতে বিশ্বাসী, সাহাবি ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাফের বলে এবং তারা শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া ব্যতীত সকল ইসলামি দলকে কাফের বলে। তাদের বিশ্বাস ইমামিয়ারা একমাত্র নাজাত প্রাপ্ত, অপর দলগুলো জাহান্নামী।[1]

২. তাকিয়্যাহ: হিযবুল্লাহ তাকিয়্যাহ ভালো বোঝে এবং তার উপর পারঙ্গমতার সাথে আমল করে। তাকিয়্যাহর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে শায়খ মুফিদ বলেন:

«كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا».

“সত্য গোপন করা, নিজের আকিদা প্রকাশ না করা, অন্তরে বিরোধীদের বিদ্বেষ লালন করা এবং দীন ও দুনিয়ার ক্ষতির আশঙ্কা হলে তাদের বিরোধিতা ত্যাগ করা”।

---

[1] আরো জানার জন্য পড়ুন: «حتى لا ننخدع» কিতাবটি।

রাফেযীদের নিকট ‘শহিদে আউয়াল’ নামে প্রসিদ্ধ মুহাম্মদ আমেলি তাকিয়্যাহর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

«التقية مجاملة الناس بما يعرفون، وترك ما ينكرون حذراً من غوائلهم»

“মানুষ যা বিশ্বাস করে, তার মাধ্যমে তাদের সাথে আচরণ করা এবং তারা যা বিশ্বাস করে না সেগুলো ফেতনার আশঙ্কায় ত্যাগ করা”।[1]

তাকিয়্যাহ একটি বড় কারণ যে, আহলে-সুন্নাহ হাসান নাসরুল্লাহর শ্লোগানে ধোঁকা খায়, যা সে টেলিভিশনের পর্দায় প্রকাশ করে, যেমন: “অতিসত্বর আমরা আকসা মুক্ত করব”| তার এমন কোনো ভাষণ নেই, যেখানে ফিলিস্তিন ও ইয়াহূদীদের আলোচনা নেই, যে কারণে মুসলিমরা তাকে বিশ্বাস করে!!

৩. প্রচার মাধ্যমের কারণেও মুসলিমরা হিযবুল্লাহ দ্বারা প্রতারিত হয়, তারা চ্যানেলের মাধ্যমে রাত-দিন বিভিন্ন ঘটনা ও হিযবুল্লাহর প্রোগ্রামগুলো পেশ করে, তাদের রয়েছে চ্যানেল ‘আল-মানার’, যা অহোরাত্র তাদের গুণকীর্তনে মশগুল। তাই এ ময়দানে তাদের সফলতা দ্রুত আসে। এ কল্যাণে হিযবুল্লাহ জনসাধারণের নিকট মুজাহিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে দখলদার হটানো, ইয়াহূদীদের থেকে মুসলিম ভূমি পুনঃ

---

[1] দেখুন: মাহদি আত্তার রচিত « «التقية منهج إسلامي واع» (পৃ.১৬)

উদ্ধার করা ও কুদস মুক্ত করা, এসব বিশেষণ দ্বারাই তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করেছে, যদিও এগুলো তাদের প্রকৃত অবস্থা নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লেবানন ও ইসলামি বিশ্বে খোমেনি বিপ্লবের প্রসার ঘটানো।

শিয়ারা কী কখনো ইসলাম ও মুসলিমের পক্ষাবলম্বন করে প্রতিরোধ করেছে?

রাফেযীরা সর্বদা মুসলিম উম্মার পিঠে ছুরি ও বিষাক্ত বর্শার মতই ছিল, এখনো আছে । খ্রিস্টানরা যখন কোনো ইসলামি রাষ্ট্রকে পদানত করতে চেয়েছে তাদেরকে ব্যাবহার করেছে। আমরা সকল রাফেযীদের চ্যালেঞ্জ করে বলছি: আমাদেরকে একজন শিয়া নেতার নাম বল, যে কোনো একটি মুসলিম রাষ্ট্র বিজয় করেছে!!

উম্মতে মুসলিমার সাথে শিয়াদের কতক গাদ্দারি:

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শিয়ারা তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র 'কুম' ব্যতীত কাউকে আনুগত্য প্রদান করে না। তারা তেহরান সরকার ব্যতীত কারো সাথে রাজনৈতিক সখ্যতা গড়ে না। শিয়া নেতৃবৃন্দের কথাবার্তা যারা জানে, তাদের নিকট বিষয়গুলো স্পষ্ট।[1]

---

[1] এ কথার স্পষ্ট সাক্ষী হচ্ছে মিসরের প্রেসিডেন্টের বাণী: তিনি ৮/৪/২০০৬ই. তারিখে আরবি চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন: শিয়াদের বন্ধুত্ব একমাত্র ইরানের সাথে, তাদের নিজ দেশের সরকারের জন্য নয়। এভাবে শিয়াদের থেকে সতর্ক করেছেন জর্দানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ এবং সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌদ ফায়সাল।

ইয়াহূদী এরিয়েল শেরুন স্বীয় ডাইরিতে বলেন: “দীর্ঘ ইতিহাসে কখনো দেখিনি শিয়াদের সাথে ইসরাইলের শত্রুতা রয়েছে”।[1]

এ থেকে আমরা উত্তর পাই যে, কেন ইসরাইল হিযবুল্লাহর পিছু নেয় না, যেরূপ পিছু নেয় হামাস ও অন্যান্য ইসলামি সংগঠনের। যেমন তারা শায়খ আহমদ ইয়াসিনকে অপহরণ করেছে, ড. আব্দুল আজিজ রানতিসি ও ইয়াহইয়াহ আইয়াশকে গুম করেছে এবং ড. খালেদ মিশআলকে অপহরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। (কিন্তু তারা কখনো কোনো শিয়া নেতাকে হত্যা করে নি)

শিয়াদের গাদ্দারির আলোচনা আমি দীর্ঘ করব না, বরং তাদের গাদ্দারির দিকে ইশারা করব এবং অনুসন্ধিৎসুর জন্য তার স্থান বাতলে দিব:

১. আমিরুল মোমেনিন আলি ইবনে আবি তালিবের সাথে তারা গাদ্দারি করেছে, ফলে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের তিরস্কার করেছেন ও তাদের কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন।[2]

২. হাসান ইবনে আলির সাথে তারা গাদ্দারি করেছে। শিয়ারা তাকে বর্শা মেরেছে ও তার নামকরণ করেছে مذلَّ المؤمنين তথা ‘মোমেনদের অপমানকারী’।

---

[1] দেখুন: শারুনের ডাইরি: (পৃ.৫৮৩)

[2] নাহজুল বালাগায় প্রদত্ত আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ভাষণ দেখুন, ড. মুহাম্মদ আবদাহ (পৃ.১৪৮), খুতবা নং: (৬৯)

৩. হুসাইন ইবনে আলির সাথে তারা গাদ্দারি করেছে। তারা তাকে চিঠির মাধ্যমে আহ্বান করে তার হাতে বায়আত করার ঘোষণা দেয়, কিন্তু যখন তিনি আগমন করেন, তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ও তাকে হত্যা করে।[1] হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের গাদ্দারির কারণে তাদের উপর বদদোয়া করেন।[2]

৪. শিয়া মন্ত্রী আলি ইবনে ইয়াকতিন হারুনুর রশিদের যুগে জেলখানার ছাদ ফেলে ৫০০-সুন্নী মুসলিমকে হত্যা করেছে।[3]

৫. ফাতেমি সরকারগুলো সুন্নত ধ্বংস ও শিয়া মাজহাব প্রচারের ক্ষেত্রে গাদ্দারির আশ্রয় নিয়েছে।[4]

৬. শিয়া কারামাতাহ সম্প্রদায় হাজিদের হত্যা করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে।[5]

৭. শিয়া ‘বুওয়াইহী’দের গাদ্দারি ও আহলে সুন্নাহর উপর তাদের জবরদস্তি মূলক আধিপত্য অনেকেরই জানা।[1]

---

[1] দেখুন: মুহসিন আমিন রচিত: أعيان الشيعة (পৃ.১/৩২)

[2] দেখুন: মুফিদ রচিত: « «الإرشاد» (২/১১০-১১১)

[3] দেখুন নিয়ামাতুল্লাহ জাজায়েরি রচিত « «الأنوار النعمانية» (পৃ.২/৩০৮)

[4] এর উদাহরণ অনেক, আরো জানার জন্য দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.৪৭)

[5] এর উদাহরণ অনেক, আরো জানার জন্য দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.৬৩)

৮. আব্বাসিয়া খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে তাতারিদের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে শিয়া মন্ত্রী আবু তালিব মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আলকামি রাফেযীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও গাদ্দারি ঐতিহাসিকদের নিকট প্রসিদ্ধ।[2]

৯. তাতারিরা যখন দামেস্কে প্রবেশ করে, তখন রাফেযীরা তাদের পক্ষ নেয় এবং তাদের অধীনে কাজ করে।[3]

১০. হালাকু যখন হালবে (আলেপ্পো) প্রবেশ করে অনেক মুসলিম হত্যা করে, তখন রাফেযীরা মুসলিমদেরকে হালাকুর নিকট আত্মসমর্পণ ও তার সাথে যুদ্ধ না করার দাবি জানায়।[4]

---

[1] এর উদাহরণ অনেক, আরো জানার জন্য দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.৭৩)

[2] এর উদাহরণ অনেক, আরো জানার জন্য দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.৮১), আরো দেখুন: শায়খ সুলাইমান আওদাহ রচিত دور الشيعة في سقوط بغداد على أيدي التتار কিতাব।

[3] দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.৯২)

[4] দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.৯৭)

১১. নাসিরুদ্দিন তুসি রাফেযী খিয়ানত করে আহলে সুন্নাহকে হত্যা করেছে, তাদের সম্পদ দখল করেছে ও তাদের ঐতিহ্যকে নিঃশেষ করেছে।[1]

১২. ইমাম মুজাহিদ সালাহুদ্দিনকে [2] হত্যার পরিকল্পনায় শিয়াদের খিয়ানত ও প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি ছিল না।[3]

১৩. সালাজেকা সুন্নী সরকারের সাথে শিয়ারা খিয়ানত করেছে ও তাদের বিপক্ষে ক্রুসেডদের সাহায্য করেছে।[4]

১৪. শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের লেবাননে আহলে সুন্নার বিরুদ্ধে গাদ্দারি করা ও তাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের সাহায্য করার ঘটনা প্রসিদ্ধ।[5]

---

[1] দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.১০১)

[2] ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সালাহুদ্দিন আইউয়ুবি রাহিমাহুল্লাহকে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করার তৌফিক দান করেছেন, তারা দু’জনই শিয়াদের নিকট কাফের।

[3] দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.১০৯)

[4] দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.১১৭)

[5] দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.১৪৫)

১৫. শিয়া সরকার ইউরোপে খিলাফতে উসমানিয়ার বিজয়কে বয়কট করেছিল । তারা খিলাফতের উসমানিয়ার বিপক্ষে খ্রিস্টানদের সাথে জোট গঠন ও পরামর্শ করেছে।[1]

১৬. শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়ারা আরব উপসাগরীয় দেশে খ্রিস্টানদের সাথে মিলে ইরাকের বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র করেছে, যা তাদের আলেম সিসতানি ও হাকিম প্রমুখদের মুখের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত।[2] মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও ইরাকে আমেরিকার প্রতিনিধি ‘পল ব্রেমার’ গ্রন্থ عام قضيته في العراق ‘ইরাকে আমার এক বছর’ থেকে ইরাক দখলে শিয়া ইমামিয়া কর্তৃক আমেরিকাকে সাহায্য করার লোমহর্ষক কাহিনী জানা যায়। তিনি বলেন: “অনেক শিয়া আমেরিকার উপর অসন্তুষ্ট যে, আমেরিকা এখনো হত্যাযজ্ঞ বন্দ করেনি, এতদ সত্যেও শিয়া নেতৃবৃন্দ, যাদের মধ্যে আয়াতুল্লাহ সিসতানিও আছেন, তাদের অনুসারীদেরকে ইরাককে সাদ্দাম মুক্ত করার আন্দোলনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমেরিকাকে সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরাও তাদের সাহায্য হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি না”।

---

[1] আরো অধিক জানার জন্য দেখুন: «الصفويون والدولة العثمانية» আলাবি ইবনে হাসান আতরাজি রচিত।

[2] দেখুন ইমাদ হুসাইন রচিত «خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية» (পৃ.১৬৭)

ইরাকে ইসলামি (শিয়া) বিপ্লব পরিষদের সর্বোচ্চ নেতা আব্দুল আজিজ হাকিম সম্পর্কে তিনি বলেন: "আব্দুল আজিজ তার রঙিন চশমা দিয়ে আমার দিকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টি দেন ও বলেন: মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনি বলেছেন নতুন সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিবে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, কারা হবে সে কর্মকর্তা? তার আরবি উপাধি উল্লেখ করে আমি তাকে বললাম: আপনাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, নতুন এ বাহিনীর প্রধান হবে শিয়া। অতঃপর বলেন: নিশ্চয় আমেরিকা তার ওয়াদা পুরোপুরি পূর্ণ করেছে"।

তিনি আরো বলেন: "সিসতানি আমেরিকার সৈন্যদের সাথে একযোগে কাজ করে, কিন্তু সে প্রকাশ্যে আমেরিকার কোনো বাহিনীর সাথে মিলতে নারাজ। আমেরিকার প্রতি তার সাহায্য ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকার কারণে প্রতিনিধির মাধ্যমে তিনি তার ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন: "ইরাককে সাদ্দাম মুক্ত করার পর আয়াতুল্লাহ উজমা এক টিভি চ্যানেলে বলেন: তিনি আমেরিকার সাথে কোনো সমঝোতায় যাবেন না। এ কথা শুনে আমিও তাকে কোনো প্রকার চাপ দেইনি, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল তার সাথে সাক্ষাত করা, যখন তার সাথে সাক্ষাত করলাম সকল সংশয় দূর হয়ে গেলো। নিশ্চয় সে ইসলাম ও আরব বিশ্বকে ভালো করেই জানে। এ জন্য তার পক্ষে সম্ভব ছিল না দখলদার আমেরিকার সৈন্যদের প্রকাশ্যে সাহায্য করা, এ ক্ষেত্রে ১৯২০ই.

সাল ও তার পরবর্তী কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও ছিল। আবার মুকতাদা সদরের ন্যায় উগ্রপন্থীদের থেকেও তার দূরে থাকা জরুরি ছিল। মুদ্দাকথা: আয়াতুল্লাহ আমাদের সাথে কাজ করবে, আর আমরা উভয়ে মিলে নিজেদের স্বার্থ ভাগ করে নিব”।

রাফেযীদের নিফাক ও মুসলিম উম্মার সাথে তাদের প্রতারণার সাক্ষী দেখুন, ‘পুল ব্রেমার’ বলছেন: “যখন আরবি ও পশ্চিমা মিডিয়াগুলো আয়াতুল্লাহ সিসতানি ও আমেরিকার সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিচ্ছে, তখনো আমি ও আয়াতুল্লাহ সিসতানি প্রতিনিধির মাধ্যমে ইরাকি বিষয়গুলো সুরাহা করতাম, ইরাকে আমেরিকার দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার সাহায্য ও সহযোগিতা বহাল ছিল।

গ্রীষ্মের প্রথম দিকে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়, যখন সে আমাকে চিঠি লিখে জানায় যে, আমি আমার অবস্থান গ্রহণ করেছি আপনাদের সাথে দুশমনির কারণে নয়, বরং আমি আয়াতুল্লাহ বিশ্বাস করি, বাহ্যিকভাবে সম্পর্ককে এড়িয়ে চলে গোপন সম্পর্ক কায়েম রাখা আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অধিক উপকারী। দখলদার আমেরিকার সাথে যদি প্রকাশ্য সম্পর্ক রাখি, তাহলে আমাদের অনেক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। যেভাবে অনেক শিয়া ও কমিউনিস্ট সুন্নী আপনাদের সাহায্য করছে। আর শিয়াদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ তো আপনাদের সাথে আছেই”

গ্রন্থকার বলেন: এরপরও কি খিয়ানত হতে পারে!

প্রিয়পাঠক, দেখলেন তো, রাফেযীদের বড় আলেম প্রকাশ্যে মানুষকে দেখাচ্ছে আমেরিকা বিরোধী, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে, তারাও তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে নিয়মিতভাবে, কারণ তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ইরাকের উপর কর্তৃত্ব হাসিল করা ও তার সম্পদকে বণ্টন করে নেওয়া। এ জাতীয় আচরণ শিয়াদের পক্ষে অসম্ভব নয়, তাদের পিতামহ ইবনে আলকামিও এরূপ করেছে, যেমন ইরাকে এ যুগে করেছে আব্দুল মজিদ খুঈ, মুহাম্মদ বাকের হাকিম ও আলি সিসতানি | তারা দখলদার আমেরিকাকে ইরাকে সাহায্য করেছে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশেও তাকে যুদ্ধ করার পথ সুগম করে দিয়েছে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

ইরাক ও আফগানিস্তান পতনে ইসলামি (!!) প্রজাতন্ত্র ইরানের ভূমিকা ও আমেরিকার সাথে তার গোপন চুক্তি কি ছিল?

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইরান পর্দার আড়াল থেকে ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে। ঘটনার শুরুতে, মাঝে ও শেষে কোথাও তার অংশ গ্রহণ কম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সাথে সেই প্রথম ইরাক ও আফগানিস্তান দখলের পরিকল্পনা করে, আমেরিকার স্বার্থে ইরান নিজের সামর্থ্য ব্যয়ে এতটুকুন কার্পণ্যও করেনি, কারণ উভয় দেশের পতন ঘটানোর পিছনে লক্ষ্য এক। পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা ও শিয়াদের প্রতিষ্ঠিত করা। এ বিষয়গুলো আমেরিকা নিজেও স্বীকার করে যে, যদি ইরান না হত তাহলে এত দ্রুত তালেবানদের হটানো সম্ভব হত না। একটি প্রবাদের মাধ্যমে ইরানের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়েছে এভাবে: “হে পারস্যের ব্রাদার, যদি তোমরা না হত, তাহলে কাবুল ও বাগদাদের পতন হত না”।

সন্দেহ নেই, ইরাকের যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করে ইরান তার স্বার্থ উদ্ধার করেছে। শিয়াদের বিরাট সংখ্যা সরকারে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করেছে খোদ আমেরিকা। এ জন্য ইরাকের নতুন সরকারকে সমর্থন দানকারী রাষ্ট্রের মধ্যে ইরান অগ্রগামী, যদিও তার প্রকৃত বৈধতা এখনো হাসিল হয়নি।

‘মুজাহিদি খলক’ অর্গানাইজেশনকে প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে সরিয়ে গায়েব করা হয়েছে। অনুরূপ আমেরিকাও ইরানকে অনেক ছাড় দিয়েছে, বর্তমান পারমানবিক কেন্দ্র স্থাপনার ক্ষেত্রেও তাকে ছাড় দিচ্ছে আমেরিকা। অচিরে পুরনো সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে গোপন যোগাযোগের ভিত্তিতে উভয় বিরাট চুক্তি করবে।

আমেরিকা-ইরাকের যুদ্ধে ইরান সম্পৃক্ত ছিল না, এ কথা মোটেও সঠিক নয়। কারণ, সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট যে, ইরান অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইরাক যুদ্ধে শতভাগ সন্তুষ্ট ছিল। যদিও ভবিষ্যতে ইরানের সীমানায় আমেরিকান সেনাবাহিনী থাকার প্রয়োজন হয়, যাদেরকে সে ‘শয়তানে আকবর’ বলে।

হিযবুল্লাহর লক্ষ্য মুসলিমদের মাঝে রাফেযী আকিদা প্রচার করা

হিযবুল্লাহ তাদের নিজস্ব চ্যানেল "আল-মানার" এর বদৌলতে ইসলামি বিশ্বে সুন্নিদের মাঝে শিয়া আকিদা প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা লাভ করেছে। এ চ্যানেলকে শিয়াদের মিম্বার বলা হয়, তাকিয়্যাহর লেবাস পরিধান করে তার সামনে তারা উপস্থিত হয়। এতে তারা এমন কথা বলে না, যার দ্বারা মুসলিমদের অন্তর আঘাত প্রাপ্ত হয়, বরং তারা সর্বদা মুসলিম ঐক্য ও ইয়াহূদীদের সাথে যুদ্ধের কথা বলে। হিযবুল্লাহর লিডার হাসান নাসরুল্লাহ সুন্নী ও শিয়াদের মাঝে ইখতিলাফি বিষয়গুলো আলোচনাতে আনে না, কারণ ইয়াহূদীদের থেকে লেবানন ও মসজিদে আকসা মুক্ত করার জন্য সে নিজেকে প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তাই অনেক মুসলিম তার কথায় ধোঁকা খেয়েছে, তারা তাকিয়ে আছে যে, হিযবুল্লাহ তাদেরকে ইসরাইল মুক্ত করবে!

হিযবুল্লাহ স্বীয় কর্মকাণ্ড ও নিজেদের স্বার্থে ইসরাইলের দিকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলকে শিয়া আকিদা প্রচারের উত্তম মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে। হিযবুল্লাহর লিডার হাসান নাসরুল্লাহ তার গুরু খোমেনির উপর রহম প্রেরণ করে, অথচ সে ইরানে ব্যাপকহারে আহলে সুন্নাহকে হত্যা করেছে। নাসরুল্লাহ খোমেনির পদাঙ্ক অনুসরণ ও তার নীতির উপর চলতে আহ্বান করে, খোমেনির মৃত্যুর পর ইরানি বিপ্লবের অভিভাবক খামেনির কাছে নাসরুল্লাহ নতুন করে

বায়‘আত করে। ফলে কোনো কোনো আহলে সুন্নাহ মনে করে বসেছে যে খোমেনী ও খামেনী বুঝি দ্বীনে ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাহায্যকারী, তাই খোমেনি ও খামেনি উভয়ের ছবি হিযবুল্লাহর প্রত্যেক জায়গায় দেখা যায়, বরং হিযবুল্লাহ উন্নত কাগজে তাদের কিতাব ছাপানো, বিতরণ করা ও বিশ্বের সকল মুসলিমের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত।

আরব দেশ থেকে হিজরত করে পশ্চিমা দেশে প্রস্থানকারী অনেকের ব্যাপারে শুনেছি, তারা হিযবুল্লাহ দ্বারা প্রভাবিত, তাদের বিশ্বাস হিযবুল্লাহ ইসলামের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারী এবং দখলদার ইয়াহূদীদের তাড়াতে বদ্ধ পরিকর। বরং শুনেছি অনেকে তাদের রাফেযী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, কারণ তারা রাফেযীদের বাতেনি (গোপন) আকিদা সম্পর্কে জানে না।

হিযবুল্লাহর নিকট বন্দী লেবানন কি ইরান-ইসরাইল যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে?

‘অদ্দাহ শারারাহ’ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন: “লেবানন যেরূপ খোমেনি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ময়দান হিসেবে পরিণত হয়েছে, সেরূপ লেবাননকে খোমেনি আন্দোলনের লক্ষ্য বাস্তবায়নেও জ্বলতে-পুড়তে হবে। হিযবুল্লাহর সাবেক মুখপাত্র ইবরাহিম সায়্যেদ বলেন: “আমাদের দৃষ্টিতে লেবানন ইসরাইলের সাথে যুদ্ধের ভূমি ও তার ময়দান, ইসলামি স্বার্থে লেবাননের এরূপ হওয়াই উচিত”।[1]

হিযবুল্লাহ যখন দু’জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করে, আর তার অনুসারীরা এ নাটকটি সত্য বলে স্বীকার করে, তখন ১৪ জুলাই ২০০৬ই. সালের জুমাবার হাসান নাসরুল্লাহ লেবাননি টিভি চ্যানেল “আল-মানার” এর পর্দায় দৃশ্যমান হন ও ঘোষণা করেন: “আজ থেকে যদি তোমরা উন্মুক্ত যুদ্ধ চাও, তাহলে উন্মুক্ত যুদ্ধই। যদি তোমরা ও তোমাদের সরকার খেলনার গুটি পরিবর্তন করতে চাও, তাহলে পরিবর্তন করে দেখ। তোমরা জান না, আজ কাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তোমরা যুদ্ধ করছ মুহাম্মদের পরিবারের সাথে, আলি, হাসান, হুসাইন ও আহলে বাইত ও রাসূলুল্লাহ

---

[1] দেখুন: অদ্দাহ শারারাহ রচিত دولة حزب الله (পৃ.৩৩৬)

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের সাথে। তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ করছ, যারা ঈমানের ধারক, যে ঈমান দুনিয়ার বুকে কারো নেই। তোমরা এমন কওমের সাথে উন্মুক্ত যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছ, যারা তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রগতি নিয়ে গর্ব করে। আরো রয়েছে তাদের পার্থিব শক্তি, যুদ্ধের ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, সুনির্দিষ্ট চিন্তা শক্তি, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহস। সামনের দিনগুলোয় আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষাত হবে, ইনশাআল্লাহ”।

তার গলাবাজির সমাপ্তিতে সে বলে: “হে আরব সরকারসমূহ, আমি আপনাদের নিকট আপনাদের ইতিহাস জানতে চাই না, একটি সংক্ষিপ্ত কথা, আমরা আত্মত্যাগী, হিযবুল্লাহর অধীন আমরা আত্মত্যাগী, আমরা ১৯৮২ই. সাল থেকে ত্যাগ স্বীকার করে আসছি। আমরা আমাদের দেশকে, বিজয়, স্বাধীনতা, ইজ্জত ও উঁচু স্থান প্রদান করেছি। এটাই আমাদের ইতিহাস, এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা, এটাই আমাদের ত্যাগ স্বীকার”।

এ ঘটনার পর যখন ইসরাইল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ও বেশুমার মানুষ হত্যা করে লেবাননের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ক্ষতি করল, তখন সোমবার ৩/০৮/১৪২৮হি. মোতাবেক: ২৭/০৮/২০০৬ই. তারিখে লেবাননি টিভি চ্যানেল New TV এর পর্দায় উপস্থিত হয় ও বলে: “আমি যদি জানতাম যে, দু’জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করার

ফলে লেবাননের এ পরিমাণ ক্ষতি হবে, তাহলে কখনো তার নির্দেশ দিতাম না"।

হাসান নাসরুল্লাহ আরো স্পষ্ট বলেছে যে, দু'জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করার ফলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তার ১% পার্সেন্ট ক্ষতিরও আশঙ্কা করিনি, কারণ যুদ্ধের ইতিহাসে এরূপ ক্ষয়ক্ষতির রেকর্ড নেই। তিনি নিশ্চিত বলেন: দ্বিতীয়বার কখনো হিযবুল্লাহ ইসরাইলের সাথে যুদ্ধের ইচ্ছা রাখে না। হিযবুল্লাহর এ নাটকের ফলাফল: লেবাননি কয়েদি ও হত্যার সংখ্যা বর্ধিত হল, দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলি কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেল এবং তারা লেবাননকে সমুদ্র ও স্থল পথে বেষ্টন করে নিলো!

লেবননিরা কি হিযবুল্লাহর প্রধানকে এ জন্য বিচারের সম্মুখীন করাবে? কেন সে লেবাননের জন্য এতো বড় মুসিবতের কারণ হল? লেবাননি সরকারের ভূমিকা দেখে তো আমার নিম্নের কবিতাই মনে পড়ে:

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود

যখন তাইম চলে যায়, তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে তারা পরামর্শও করে না।

একটি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে অপর দেশের সাথে যুদ্ধের বিষয়, সেই যুদ্ধ যদি হয় দেশের কর্তা ব্যক্তিদের অজ্ঞতাসারে, তাদের পরামর্শও যদি গ্রহণ না করা হয় এবং

তাদের পরামর্শ ব্যতীত যুদ্ধ শেষ হয়! তাহলে কে দেশ চালায়? কাকে কে চালায়? কোন্ সংবিধান ও নীতির বলে এরূপ ঘটে!!!? লেবাননি সরকারের ভূমিকা কি, যার দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের নিরাপত্তা প্রদান করা, ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করা, এত লোক হত্যা করা হল, এতো ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করা হল এবং অর্থনৈতিক এতো ক্ষতি হল, তবুও কি লেবাননি সরকার হাসান নাসরুল্লাহ কিংবা হিযবুল্লাহকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাবে না?!

আমরা আশঙ্কা করছি, এ জন্য হিযবুল্লাহ উল্টো সরকারকেই দায়ী করবে, অথবা দক্ষিণ লেবাননে আহলে সুন্নাহকে দায়ী করবে, অথবা ফিলিস্তিন শিবিরে বসবাসকারী কাউকে দায়ী করবে, যে কোনো অজুহাতেই হোক।

এখানে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন: ইসরাইল ও আমেরিকা কেন হামাসের সাথে আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল? অথচ দেশের জনগণ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে হামাসকে গ্রহণ করেছে, যারা ছিল বৈধ সরকার!

পক্ষান্তরে তারা হিযবুল্লাহর সাথে সমঝোতা করে, যাকে লেবাননের সরকারের ভেতরে সরকার গণ্য করা হয়, অথবা যার কার্যক্রম একটি মাফিয়া চক্রের ন্যায়! দু’জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করে সে লেবাননের উপর ইসরাইলকে ধ্বংসযজ্ঞ

পরিচালনার পথ সুগম করে দিয়েছে । এরূপ কাজ হাসান নাসরুল্লাহর পূর্বে তার উত্তরসূরি আব্বাস মুসাভিও করেছে। ১৯৮৬ই. সালে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে দু’জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করে লেবাননে তাদেরকে হামলার সুযোগ করে দিয়েছিল, যার ফলে তারা লেবাননি সামরিক শক্তি ও তাদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।[1]

আমাদের দৃষ্টিতে হিযবুল্লাহ দু ’জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করে ইসরাইলকে যেভাবে ইচ্ছা লেবাননে হামলার সুযোগ করে দিল। আমরা আশ্চর্য ইহ না যে, তৃতীয়বার হাসান নাসরুল্লাহ কিংবা তার উত্তরসূরি কেউ এরূপ করবে না, যদি হিযবুল্লাহকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। যিনি বলেছেন, সত্যই বলেছেন: ইসরাইলের স্বার্থ হচ্ছে হিযবুল্লাহর বেঁচে থাকা এবং হিযবুল্লাহর স্বার্থ হচ্ছে ইসরাইলের বেঁচে থাকা!

---

[1] দেখুন: মুহাম্মদ আলি খানুন রচিত: أمير القاقلة (পৃ.১০১)

ইরাকে ক্রুসেডার খ্রিস্টানদের যুদ্ধের সময় হিযবুল্লাহ ও তার অনুসারী ইমামিয়া শিয়ারা কোথায় ছিল?

ড্যানিয়েল সোপলম্যান বলেন: “হিযবুল্লাহ আমেরিকান হামলা ও সাদ্দাম সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান শুধু গোপন করেনি, বরং একেবারে খামোশ ছিল। সর্বপ্রথম তখন মুখ খোলে, যখন হিযবুল্লাহ বলে যে, আমেরিকান সৈন্যদের মোকাবিলার জন্য ইরাকে আমরা কোনো সাহায্য প্রেরণ করিনি। পরবর্তীতে যখন বাগদাদ থেকে ঘোষণা করা হল যে, ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডার থেকে হিযবুল্লাহর ছয়জন সদস্য গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন হিযবুল্লাহ সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করে বলে, তারা হিযবুল্লাহর সদস্য নয়”।[1]

শিয়াদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আয়াতুল্লাহ উজমা আলি সিসতানির নাজাফের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা আমেরিকান সৈন্যদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে [সুন্নিদের] চলতি লড়াই প্রতিহত করবে।[2] ‘আল-ওয়াতন আল-কুয়েতিয়াহ’ পত্রিকা বলেছে, লেবাননি হিযবুল্লাহ ইরাকে কয়েকটি ক্যাম্প করেছে। সেখানে তারা ৯০-জন সদস্য প্রেরণ করেছে, যারা সিরিয়ার বর্ডার দিয়ে

---

[1] দেখুন: «قواعد جديدة للعبة: إسرائيل وحزب الله بعد الانسحاب من لبنان» সর্বশেষ পৃষ্ঠায়।

[2] দেখুন: صحيفة الوطن الكويتية তারিখ: (২৯/৮/২০০৪ই.

ইরাকে প্রবেশ করবে। [1] তাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধের রসদ সরবরাহ করা এবং শিয়া মতবাদের প্রভাব বিস্তার, বিভিন্ন এলাকায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা ও সুন্নিদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করার লক্ষ্যে শিয়া মিলিশিয়া যেমন ফিলাক বদর ও জায়শে মাহদি ইত্যাদি সংস্থায় সংবাদ আদান-প্রদান করা।[2]

২০০৬ই. সালের অক্টোবর মাসে লেবাননি হিযবুল্লাহর দাওয়াতের প্রেক্ষিতে ৩৫-জন ‘জায়শে মাহদি ইরাকী’র সদস্য লেবাননে যায়, উদ্দেশ্য সামরিক সহযোগিতা ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ হাসিল করা; অতঃপর হিযবুল্লাহ তাদেরকে আহলে সুন্নাহদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা পেশ করে, কারণ তারা (এ সুন্নিরা) ‘শিয়া হিলাল’ বা ‘নয়া চাঁদের মত’ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিরোধিতা করছে![3]

---

[1] দেখুন : جريدة الوطن الكويتية তারিখ: ২৯/১১/২০০৩ই.

[2] আমরা অনেক শুনি ও দেখি যে, লেবাননের শিয়ারা আমেরিকা ও ইসরাইলকে গালমন্দ করে। আবার আমরা এও দেখি যে, খ্রিস্টান দখলদার আমেরিকা ও শিয়াদের আলেমদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আরো দেখছি যে, শিয়া জনসাধারণ কিভাবে দখলদার আমেরিকার জন্য সেবক ও খাদেম বনে গেল।

[3] দেখুন: موقع مفكرة الإسلام الإخباري শাউয়াল, ১৪২৭ইহ. মোতাবেক: ২৫ অক্টোবর, ২০০৬ই.

লেখক বলেন: হে আমার মুসলিম ভাই, দেখুন আমেরিকার বিরুদ্ধে পরিচালিত [সুন্নিদের] যুদ্ধ কিভাবে তারা প্রতিহত করে, অথচ আমেরিকা কাফের, একটি মুসলিম দেশের দখলদার!! আমাদের প্রশ্ন: লেবাননের স্বার্থে যোদ্ধারা [হিযবুল্লাহ] জান্নাতে যাবে, আর ইরাকের স্বার্থে যোদ্ধারা [সুন্নিরা] জাহান্নামে যাবে? ইরাক ও লেবানন কি দু'টি মুসলিম দেশ নয়?

কারণ কি এটাই যে, লেবানন রক্ষার যুদ্ধের সাথে ইরান ও সিরিয়ান স্বার্থ জড়িত, কিন্তু ইরাক রক্ষার যুদ্ধে সাথে তাদের সেই স্বার্থ নেই! এ জন্য হিযবুল্লাহ লেবাননের পক্ষে ও ইরাকের বিপক্ষে যুদ্ধ করে।

দু'জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণের নেপথ্যেহিযবুল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

১. পারমাণবিক স্থাপনা তৈরির কারণে ইরানের উপর থেকে বিশ্বের চাপ লাঘব করা, যেন পুরো বিশ্ব ইরান থেকে দৃষ্টি হটিয়ে লেবানন ও তার জনগণের প্রতি দৃষ্টি দেয়।

২. ইরাকের জায়শে মাহদি ও বদর সংগঠনকে সুযোগ দেওয়া, যেন তারা যেভাবে ইচ্ছা আহলে-সুন্নাহকে হত্যা করে, তাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে, তাদের রক্ত ও সম্পদকে বৈধ মনে করে, তাদের মসজিদের উপর আধিপত্য লাভ করে ইত্যাদি, ইরাকে এসব হচ্ছে আমেরিকার ছত্রছায়া ও ইরানি শিয়া নেতা আলি সিসতানির নেতৃত্বে।

৩. আমেরিকাকে পারমানবিক অস্ত্র প্রসঙ্গে মেসেজ দেওয়া যে, আমরা [ইরান] ইচ্ছা করলে ইরান ও উপসাগরীয় দেশ থেকে যুদ্ধকে ইসরাইল ও লেবানন পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারি।

৪. লেবানন থেকে সিরিয়ার চলে আসা ও সেখানে তার ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার পর লেবাননিদের মাঝে জাতীয়তাবাদ দৃঢ় হয়েছিল। এর মাঝে সিরিয়া এবং তার পশ্চাতে ইরান সেখানে তাদের ক্ষমতা পুনর্বহাল করতে চাইল। তাই তারা নতুন গুটি চালনা আরম্ভ করল। বিশেষ করে যখন বিশ্ব ও লেবাননি সরকার চাপ দিয়েছিল যে, হিযবুল্লাহ তাদের অস্ত্র ছেড়ে জাতীয় সেনাবাহিনীতে

যোগ দিবে। এটা ইরানের স্বার্থের জন্য বিরাট কাটা হয়ে দাঁড়াল। তাই দু'জন সৈন্য অপহরণ করার নাটক করল, যেন প্রতিরোধের নামে হিযবুল্লাহর হাতে অস্ত্র থাকে।[1]

৫. ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে বিশ্বের দৃষ্টি হটানো। ইসরাইল-ইরান অস্ত্র ক্রয় চুক্তির ফলে অনেকটা কোণঠাসা ছিল শিয়া-ইরান, যা 'ইরান গেট' ক্যালেঙ্কারি নামে পরিচিত। অনুরূপ তালেবান ও ইরাক সরকার পতনে শয়তানে আকবরের সাথে ইরানের সহযোগিতা প্রকাশ হওয়া, ইরাকে শিয়া মতবাদ ও তার সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সুন্নিদেরকে হত্যা করা, বাড়ি-ঘর থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া ও তাদের উপর ইরান ও আমেরিকার যৌথ নির্যাতনের চিত্র বিশ্বের জানা-জানির প্রাক্কালে এ ঘটনা রচনা করল হিযবুল্লাহ, যেন সুন্নিরা জানে হিযবুল্লাহ ও ইরান ইসরাইল বিরোধী।

---

[1] মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আহমদ আবুল গাইত্ব ২২/১০/২০০৬ই. সালে আল-জাজিরা ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমকে বলেন: "দু'জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে লেবাননের সমঝোতাকে নস্যাৎ করা, কারণ হিযবুল্লাহর অস্ত্র ছেড়ে সরকারী দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ইরান তার স্বার্থের জন্য এটা হতে দিল না। 'শাবআ কৃষি অঞ্চল ও অন্যান্য স্থান যেখানে হিযবুল্লাহ বসবাস করে, যা স্বাধীন করার কথা তারা বলে, তা এখনো ইসরাইলের দখলে আছে। দু'জন সৈন্য অপহরণ করার ফল লেবানন ও হিযবুল্লাহর কিছু হাসিল হয়নি, শুধু ধ্বংস ও লজ্জাকর পরাজয় ব্যতীত।

ফিলিস্তিনি লেখক গাজি তাওবা বলেন: “ইয়াহূদীদের সাথে হিযবুল্লাহর যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য লেবানন, আরব বিশ্ব ও ইসলামি দুনিয়ায় শিয়া ও ইরানের পক্ষে প্রোপাগান্ডা করা, অপর দিকে ইরাকে সুন্নী মুসলিমের উপর পরিচালিত ইরানি নির্যাতনের উপর পর্দা টেনে দেওয়া।[1]

---

[1] দেখুন: جريدة الحياة তে গাজি তাওবার প্রবন্ধ, সংখ্যা: (১৫৮৪৮), তারিখ: ২৫/৮/২০০৬ই. (পৃ.১৯)

আমরা কি দখলদার ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে জিহাদকে হারাম করে দেব?

ইমাম ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন [1]: জিহাদ ফরজে কিফায়াহ, যদি কোনো এক কওম জিহাদের পক্ষে দাঁড়ায়, তাহলে অন্যদের উপর থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

[التوبة:122].

"আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে"। [2]

তিনটি স্থানে জিহাদ ফরজ:

---

[1] দেখুন: 'মুগনি' লি ইবনে কুদামাহ: (১৩/৬)

[2] সূরা তাওবা: (১২২)

১. যখন মুসলিম ও কাফের দুই দল মুখোমুখি হয়, তখন উপস্থিত মুজাহিদদের উপর জিহাদ করা ওয়াজিব, পলায়ন করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤٥ ﴾ [الانفال: ٤٥]

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও”।[1]

২. যদি কোনো এলাকায় কাফেররা অনুপ্রবেশ করে, তখন তাদেরকে প্রতিহত করা ও তাদের সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

৩. যদি ইমাম (মুসলিম শাসক) কোনো সম্প্রদায়কে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হতে বলে, তখন তাদের উপর যুদ্ধ ওয়াজিব হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ ٣٨ [التوبة: 38].

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা জমিনের প্রতি প্রবল ঝুঁকে পড়?”[1]

---

[1] সূরা আনফাল: (৪৫)

অতঃপর ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার সাতটি শর্ত উল্লেখ করেন: ১. ইসলাম, ২. সাবালক, ৩. বিবেক, ৪. স্বাধীন, ৫. পুরুষ, ৬. শারীরিকভাবে সুস্থ, ৭. জিহাদের খরচের মালিক।

কেউ হয়তো বলতে পারে, ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা কেন শিয়া ইমামিয়াদের সাথে মিল না?

আমাদের উত্তর: রাফেযীরা আহলে-সুন্নাহর সাথে কখন এক হয়েছে?

আপনি মুসলিম সেনাপতি সালাহুদ্দিন আইউয়ূবী রাহিমাহুল্লাহুর জীবনী দেখুন। তিনি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ ও কুফরের কালেমাকে পরাস্ত করার জন্য জিহাদ করেছেন। এ বীর পুরুষ প্রথম শিয়া ইসমাইলিয়াকে ক্ষমতা থেকে পদচ্যুত করেন এবং তাদেরকে সরকারী কাজ ও শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে নিক্ষেপ করেন, অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার জন্য ইয়াহূদীদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

সন্দেহ নেই, ইয়াহূদীদের মৃত্যু ও তাদের দুর্যোগে আমরা খুশি হই, যে পরিমাণেই হোক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা হিযবুল্লাহর নাটক, মিথ্যা প্রচার ও লোক দেখানো শ্লোগানে ধোঁকা

---

[1] সূরা তাওবা: (৩৮)

খাব, যেভাবে তারা সাধারণ ও সরলমনা মুসলিমদের শিকার করে। আমরা ভালো করেই জানি, হিযবুল্লাহ লেবাননে শুধু ইরানের স্বার্থেই যুদ্ধ করে। তার উদ্দেশ্য কখনো পবিত্র ইসলামি ভূমি রক্ষা করা কিংবা বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করা নয়।

কয়েকটি প্রশ্ন

১. ইরান কেন লেবাননি জনগণের পক্ষে সামরিক শক্তি নিয়ে অগ্রসর হল না, অথচ ইসরাইল যখন সিরিয়ায় হামলা করে তখন সে সামরিক শক্তি নিয়ে অগ্রসর হয়?!

২. হিযবুল্লাহ কেন ইসরাইলি জেলখানায় বন্দি লেবাননি জনগণের মুক্তির দাবি করে,[1] অথচ সিরিয়ায় বন্দি লেবাননি আহলে-সুন্নাহর পক্ষে একটি কথাও বলে না?!

৩. ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদ কেন হিযবুল্লাহর পাশে দাঁড়িয়ে ইরানিদেরকে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিষেধ করেছে,[2] অথচ সেই বলেছে ‘ মানচিত্র থেকে ইসরাইলকে মুছে ফেলা জরুরি’।

৪. যখন হামাসের দু’জন নেতা: আহমদ ইয়াসিন ও আব্দুল আজিজ রানতিসিকে হত্যা করা হয়, তখন কেন হিযবুল্লাহ একটি মিসাইলও ইসরাইলের দিকে নিক্ষেপ করেনি, অথচ হামাস ইসরাইলের কলিজায়, তখন তারই বেশী প্রয়োজন ছিল সাহায্য,

---

[1] দেখুন: হিযবুল্লাহর নির্বাচনী প্রোগ্রাম: ১৯৯৬ই. আরো দেখুন: নায়িম কাসেম রচিত حزب الله (পৃ.৩৯৪)

[2] দেখুন: جريدة الرياض সংখ্যা: (১৩৯১৬), সোমবার, ৬-রজব, ১৪২৭হি. মোতাবেক: ৩১-জুলাই, ২০০৬ই.

সমর্থন ও অস্ত্রের, বিশেষ করে হিযবুল্লাহ যেহেতু বারবার টিভির পর্দায় বলে: বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন মুক্ত করা হবে?!

৫. হিযবুল্লাহ দু'টি উদ্দেশ্যে দু'জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করেছে:

ক. হিযবুল্লাহর কয়েদিদের মুক্ত করা।

খ. ফিলিস্তিনের জমিন মুক্ত করা, (নাসরুল্লার ঘোষণা মতে)।

কিন্তু ফলাফল হয়েছে তার উল্টো, ইসরাইলের অধীন আগের তুলনায় অধিক জমি চলে গেছে, অন্যান্য জমির উপর ইসরাইল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসরাইলি জেলখানায় কয়েদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নাসরুল্লাহ "আল-মানার" চ্যানেলের বদৌলতে চাপাবাজি ব্যতীত আর কিছুই হাসিল করতে পারেনি?

৬. যদি হাসান নাসরুল্লাহ ও তার দল ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হত, যেমন অনেকে ধারণা করেন, তাহলে কেন হিযবুল্লাহর লিডার ইসরাইলের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয় না?

৭. হাসান নাসরুল্লাহকে গ্রেফতারের জন্য কেন অর্থ ঘোষণা করা হয় না, অথচ অন্যান্য মুজাহিদকে গ্রেফতারের জন্য অর্থ ঘোষণা করা হয়?

৮. অন্যান্য ইসলামি দল ও সংগঠনের ন্যায় ইসরাইল কেন হিযবুল্লাহর সম্পদ সিলগালা করে না?

৯. আমরা অনেক শুনেছি, বারবার শুনেছি যতক্ষণ না ‘শাব‘আ’ কৃষি ভূমি ফেরত পাব, হিযবুল্লাহ ইয়াহূদীদের যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না, অথচ এখন যুদ্ধ থেকে পিছু টান দিয়েছে, যদিও ইয়াহূদীরা লেবাননের এলাকা থেকে সরে যায়নি!

১০. আত্মসম্মান বোধ বীর-বাহাদুর নেতাদের ন্যায় হাসান নাসরুল্লাহ কেন জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের সাথে অংশ গ্রহণ করে না, অথচ তার অনুসারীরা স্বাদ-বিষাদের মুখোমুখি হয়, তিনি আরামে থাকেন?

১১. হাসান নাসরুল্লাহ বলে ফিলিস্তিনে ইসরাইল হেরে গেছে, যদি তাই হয় তাহলে কেন হাসান নাসরুল্লাহ তাদের উপর হামলা করে না?

১২. ইরাক যুদ্ধ ও আহওয়ায রাজধানীতে আহলে সুন্নাহকে দমন করার জন্য হিযবুল্লাহ কেন ইরানের সাথে অংশ নিয়েছে, অথচ দখলদার আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি? হাসান নাসরুল্লাহ কেন আমেরিকান সৈন্য হত্যার ফতোয়া প্রদান করে না, অথচ তারা ইরাকের দখলদার, যেখানে রয়েছে তাদের একাধিক পবিত্র ভূমি, ইমামদের কবর ও মাজারসমূহ!?

পরিশিষ্ট

হিযবুল্লাহর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেলের সাক্ষাতকার, যা "আশ-শারকুল আওসাত" পত্রিকা ২৯-রজব, ১৪২৪হি. মোতাবেক: ২৫-সেপ্টেম্বর ২০০৩ই. ৯০৬৭ সংখ্যায় বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে।

হিযবুল্লাহর সাবেক সাধারণ সম্পাদক 'সুবহি তুফাইলি' "আশ-শারকুল আওসাত" পত্রিকায় দেওয়া এক ইন্টার্ভিউতে বলেন: "বিশ্বের শিয়াদের জন্য ইরান একটি হুমকি ও আমেরিকান প্রকল্প বাস্তবায়নের ঠিকাদার| লেবাননি প্রতিরোধ আন্দোলন হিযবুল্লাহ-কে হাইজ্যাক করে ইসরাইল এর সীমান্ত পাহারাদার বানিয়েছে সে।

বৈরুত থেকে 'সায়ের আব্বাসে'র রিপোর্ট:

লেবাননি হিযবুল্লাহর সাবেক সাধারণ সম্পাদক শায়খ সুবহি তুফাইলির সাক্ষাতকারটি বালাবাক্কা জেলার দক্ষিণে বারিতাল নগরীতে অবস্থিত হুসাইনি পুরাতন বিল্ডিংয় থেকে নেওয়া হয়েছে। হিযবুল্লাহ ও লেবাননি সরকারের সাথে তার লাগাতার সমস্যা, অমিল ও ইখতিলাফের কারণে ১৯৯৭ই. সাল থেকে তিনি নেতৃত্বের আড়ালে চলে গেছেন। ইরানের সাথে তার দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিন্নতার কারণে হিযবুল্লাহ ত্যাগ করে তার মূল্য দিতে হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন হিযবুল্লাহর একজন প্রতিষ্ঠাতা ও তার প্রথম

সেক্রেটারি জেনারেল। এই মতভেদ হামলার রূপ নেয়, যার ফলে এক সেনা অফিসার ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি শায়খ খিদির তালিস মারা যান, যিনি তুফাইলির পক্ষাবলম্বন করে ছিলেন, সাথে আরো কয়েকজন সঙ্গীকে মারা হয় হিযবুল্লাহর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেন এই সুবাদে তুফাইলিকে লেবাননি আদালতে তলব করা যায়। ছয় বছর তার ব্যাপারে কখনো উপস্থিত কখনো গায়েব হিসেবে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে, যা চিন্তা করলে খুব অবাক করার বিষয়, তবে এটা লেবাননি স্বভাব বনে গেছে। এ ছয় বছর সে দোস্ত-দুশমন সবার জানাশোনা জায়গায় ছিল। তবে কখনো কখনো তাকে কঠিন চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যদিও তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়নি।

আত্মগোপনের দীর্ঘ সময়ে কখনো শায়খ তুফাইলি জনসম্মুখে আসতেন। ২০০০ই. সালে তিনি বেক্কা প্রদেশের নির্বাচনে জোরালো ভূমিকা রাখেন। অনুরূপ ২০০২ই. সালে (এম.টি.বি.) এর পর্দায় হঠাৎ তাকে দেখা যেত, যা পরবর্তীতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এসব সাক্ষাতের কারণে আমাকে অপবাদ দেওয়া হয় যে, আমার কারণেই উপনির্বাচনে আমার নির্বাচিত প্রতিনিধি ‘গাবরিয়াল মুর’ জয়ী হন, পরবর্তীতে যার এমপি পদ বাতিল করা হয়েছে। এভাবে সময়ে সময়ে পর্দার সামনে আসার কারণে তুফাইলিকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে,

যা কঠিন থেকে কঠিন হয়েছে, যার সমাপ্তি ঘটে হুসাইনি বিল্ডিংয়ের বন্দি জীবনে অবস্থান করে।

শায়খ তুফাইলি বেক্কা শহরে খুব শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকার মানুষ, তিনি "আশ-শারকুল আউসাত" পত্রিকার মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন, যদিও তার উপর তখন চাপের সীমা ছিল না।

আমরা এখানে শুধু সাংবাদিক হিসেবে তার একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, কারণ তার মত ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা ও জানার পরিধি খুব প্রশস্ত, বিশেষভাবে যিনি হিযবুল্লাহর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি নিজ যুগে লেবাননের জমি থেকে ইসরাইলকে বের করে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন মতভেদ ও ইখতিলাফ সত্যেও তিনি সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাতকার দিয়েছেন, যেখানে "আশ-শারকুল আউসাত" পত্রিকার বেক্কার প্রতিনিধি হুসাইন দরবেশ উপস্থিত ছিলেন। এতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতকারে তিনি ইরানের কঠোর সমালোচনা করেন, যার ভাষা ছিল এরূপ: "ইরান লেবানন ও অন্যান্য এলাকার শিয়াদের জন্য হুমকি"।

প্রশ্ন: [হিযবুল্লাহর] এখন প্রতিরোধ ও যুদ্ধের কি প্রয়োজন নেই?

উত্তর: এটা কি আলোচনার বিষয়? হিযবুল্লাহর ইসরাইল প্রতিরোধ তখনি শেষ হয়ে গেছে, যখন ১৯৯৪ই. সালের জুলাই ও ১৯৯৬ই.

সালের এপ্রিলে ইসরাইলের সাথে হিযবুল্লাহর নেতৃবর্গ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সম্পাদিত এ চুক্তিতে ইসরাইলি আবাসিক এলাকাকে হিযবুল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ চুক্তিকে লেবাননের বিজয় জ্ঞান করা হয়, কারণ তা লেবাননি নাগরিককে সুরক্ষা ও হিযবুল্লাহর প্রতিরোধকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যদিও এখনো সময়ে সময়ে 'শাব'আ' কৃষি ভূমিসমূহে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে, এতে সমস্যা নেই কারণ ইসরাইল খুশি। এ সমঝোতার মূল হচ্ছে হিযবুল্লাহর প্রতিরোধ থেকে পিছু হটে ইসরাইলের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

ইসরাইল যেরূপ مزارع شبعا ['মাজারে শাব'আ'] দখল করেছে, অনুরূপ ফিলিস্তিনি অন্যান্য ভূমিও দখল করেছে, কিন্তু হিযবুল্লাহর শুধু 'মাযারে' শাব'আ' নিয়ে মাথা ব্যথ্যা , অন্যান্য ভূমির প্রতি আগ্রহ নেই কেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য জানেন কি? সন্দেহ নেই, অন্যান্য ভূমির প্রতি হিযবুল্লাহর অনীহা প্রমাণ করে, সেখানে তারা ইসরাইলের দখলদারিত্ব মেনে নিয়েছে। আমার নিকট 'খিয়াম' (লেবাননের সীমান্ত শহর) এবং ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে উক্কা ও হায়ফার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় আমার নিকট সমান। আমাকে খুব কষ্ট দেয়, যখন শুনি যে, যারা আমার সাথে ওয়াদা করেছিল এরাবিক অধিকৃত ভূমি মুক্ত করার

জন্য মরতে হলে মরবো, তারাই আজ ইসরাইলি সীমান্তে প্রহরীর কাজ করছে। যারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাদেরকে পাকড়াও করে জেলে দেয় এবং নিকৃষ্টতম শাস্তি প্রদান করা হয়।

২. কোন জেলে?

উত্তর: আমি এ ব্যাপারে অনেক বলেছি, যারাই ইসরাইলকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, তাদেরকে লেবাননি সরকারের নিকট সোপর্দ করা হয়, সরকার তাদেরকে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

৩. আপনি কি বিশ্বাস করেন, এ চুক্তির কারণ হচ্ছে লেবানন ও শামের উপর থেকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপ কমানো?

উত্তর: আমি সুযোগ সন্ধানের বিপক্ষে নই, এটা একটা হিকমত, কিন্তু যা ঘটছে তা হিকমত নয়। আপনি সুযোগের অপেক্ষার কথা বলবেন, আমি বলি দেশীয়ভাবে এরূপ সুযোগ আসা অসম্ভব, কারণ এসব চাপ কখনো কমবে না, আমাদের সুযোগও কখনো আসবে না। আমি আমাদের প্রতিরোধকারী সন্তানদেরকে বলছি: তোমরা যা করছ তা হারাম, দুশমনের সেবা এবং গাদ্দারি। তোমরা তোমাদের অস্ত্র নিক্ষেপ করে বাড়িতে চলে যাও, অথবা বিদ্রোহী হয়ে দুশমনের দিকে আগুনের গোলা নিক্ষেপ কর। খবরদার! কোনো ফতোয়া অথবা বিলায়াতুল ফকিহর নামে কেউ যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়। দুনিয়ায় এমন কোনো ফকিহ

নেই, যে আমাকে দুশমনের সেবার জন্য নির্দেশ দিবে। আমি খুবই দুঃখিত, যে প্রতিরোধ আমরা আমাদের শহীদদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে তুলেছি, তা আজ দুশমনের সেবা করছে।

৪. আপনার প্রতি কখন থেকে ইরান নাখোশ, আপনাকে হিযবুল্লাহর নির্বাহী কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইরানের হাত আছে কি?

উত্তর: আমার সাথে কৃত সকল অন্যায় সত্ত্বেও আমি চেয়েছি, আমার ব্যক্তিগত বিষয়গুলো জাতীয় বিষয় থেকে আলাদা থাক। যেমন বর্তমান কিংবা অতীতে ইরানের সাথে আমার সমস্যার কারণে কখনো ইরানকে দোষারোপ করিনি | আমি জাতীয় কোনো বিষয়কে কখনো ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত করতে চাইনি। কিন্তু যখন দেখলাম প্রতিরোধ আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেছে এবং ইরান আমেরিকার সাথে মিশে গেছে, তখন আমি আমার নীরবতা থেকে বের হয়ে আসছি।

৫. আমরা হিযবুল্লাহর আদর্শ পরিবর্তনের দিকে ফিরে আসছি, আপনারা যখন হিযবুল্লাহর নেতৃত্বে ছিলেন, তখন হিযবুল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যেমন দুশমনের সাথে সমঝোতা না করা, শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি, তখন হিযবুল্লাহ কিছু কঠিন কাজও করত, যেমন পাশ্চাত্যদের অপহরণ করা ইত্যাদি।

উত্তর: পশ্চিমাদের অপহরণ করা বিষয়ে অন্য সময় বলব, তবে আমরা বলতে চাই যে, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর আপনি যে হিযবুল্লাহর আদর্শ পরিবর্তনের কথা বলছেন, তার সারাংশ হচ্ছে দু'টি বিষয়: এক. এখানে ইরানি রাজনীতি কাজ করছে, যার শুরু হয়েছে ইমাম খোমেনির মৃত্যুর পর। তখন থেকে আমরা ধারণা করেছি যে, আমাদের ইসলামি মূল্যবোধের সাথে তাদের টক্কর বাধবে। দুই. ইরানে কিছু লোক আছে, যারা আমাদের নৈকট্য পছন্দ করে না।

৬. প্রশ্ন: আপনি নিজেকে উদ্দেশ্য করছেন?

উত্তর: আমি ইরানিদের বারবার বলেছি, যদি তোমাদের স্বার্থ আমার স্বার্থের বিপরীত হয়, তাহলে অবশ্যই আমি আমার স্বার্থকে প্রাধান্য দিব। আমি কখনো ইরানের রাজনৈতিক এজেন্ট ও তার তাবেদার হব না। আমি তোমাদের ভাই ও অংশীদার, তার চেয়ে বেশী বা কম নয়। তবে এ কথাও ঠিক যে, শক্তিশালীরা অংশীদারিত্ব পছন্দ করে না, তারা এমন দুর্বলকে চায় যারা তাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবে। আমি আমার স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করতে চাই না। কোনো মুসলিম ফকিহ দুর্বল ও গরিব মুসলিমদের বিপক্ষে সাহায্যের কথা বলতে পারে? অতএব আপনি যখন সরকারের সাথে চলবেন না, আপনাকে সম্ভাব্য সকল পথে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হবে।

৬. আপনার পরবর্তীতে হিযবুল্লাহ শুধু লেবাননের গান গায়?

উত্তর: যে বলে ইরান লেবাননে হস্তক্ষেপ করে না, সে মিথ্যাবাদী, সিদ্ধান্ত বৈরুতে নয়, সিদ্ধান্ত হচ্ছে তেহরানের হাতে।

৭. আপনার সময়েও কি এরূপ ছিল?

উত্তর: হ্যাঁ, আমার সময়েও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল ইরানের হাতে। তবে ইরান আমাদের প্রতি কোনো নির্দেশ বা পরামর্শ দিলে, আমরা সেটাকে আমাদের উপর ওয়াজিব মনে করতাম না, বরং আমাদের ইচ্ছাধীন মনে করতাম। যখন ইমাম খোমেনি অথবা তার কোনো প্রতিনিধির পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসত, যেমন ‘ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ করুন’ সেটাকে আমরা নির্দেশ মনে করতাম না, বরং আমাদেরই বিবেচনাধীন মনে করতাম।

৭. খোমেনির মৃত্যুই কি ইরানের সাথে আপনার বিচ্ছেদের শুরু?

উত্তর: আমি বলছি, তখন থেকেই বৈপরীত্য শুরু।

৮. তখন সিরিয়ার অবস্থান কেমন ছিল?

উত্তর: সিরিয়া যখন দেখল যে, ইসরাইল অবশ্যই লেবাননের জলাশয়ে নামবে, তখন সে ইসরাইলকে ঘিরে ফেলার ইচ্ছা করল, কিন্তু লেবাননি সরকার তাকে ‘জাযিন’ এলাকায় সৈন্য পাঠাতে নিষেধ করে দিল, যা তাদের থেকে হাত ছাড়া হয়ে গেছে। যখন দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরাইল সৈন্য হটে গেল, তখন ‘শাব‘আ’ কৃষি ভূমি চাপের সম্মুখীন হল। হয়তো সিরিয়া চেয়ে ছিল যেভাবে

হোক এপ্রিল চুক্তি মোতাবেক সমঝোতা করে নেওয়া, কিন্তু ইরানের চিন্তা ছিল আরেকটি, আমার মনে পড়ে তখন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমেরিকার ইচ্ছায় চুক্তি করেন এবং হিযবুল্লাহকে যুদ্ধের ময়দান থেকে হটিয়ে দেন।

৯. আমরা দেখছি আপনি ইরাকি শিয়াদের কর্মকাণ্ডে না-খোশ, তাদের লক্ষ্য কি?

উত্তর: ইরাকে শিয়াদের অবস্থা অন্যান্য এলাকার মতই, সেখানে বিবেকের আগে অন্য কিছু তাদেরকে তাড়িত করে। ফিলিস্তিনি কিছু লোকের কর্মকাণ্ডের কারণে দক্ষিণ লেবাননের শিয়া অধ্যুষিত এলাকার লোকেরা ইসরাইলকে ফুল ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অভ্যর্থনা দিয়েছে, যারা দু'বছর না যেতেই প্রতিরোধকারী বনে গেছে। এ জন্য আমি বিশ্বাস করি শিয়াদের অবস্থা পরিবর্তনে বেশী সময় লাগবে না। তবে সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিকদের নিয়ে, কারণ রাজনৈতিক অনেক কর্মকাণ্ড ইরান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যার সাথে রয়েছে আমেরিকার গভীর সখ্যতা । সেই শিয়া রাজনীতি নির্দেশ করে তোমরা আমেরিকার সরকার মেনে নাও এবং তার সদস্য বনে যাও।

১০. একদিকে আমেরিকার সাথে ইরানের চুক্তি, অপর দিকে পারমানবিক স্থাপনার কারণে ইরানের উপর আমেরিকান চাপের মাঝে কোনো বৈপরীত্য দেখেন কি?

উত্তর: আমরা আমাদেরকে প্রতারিত না করি। আমি বলি: ইরাক যুদ্ধের পূর্বে ইরান-আমেরিকা সমঝোতা হয়েছে এবং তার জন্যে ইসলামি বিপ্লব ইরানের সর্বোচ্চ পরিষদের একটি কমিটি ওয়াশিংটন সফর করেছে। ইরাকে যেসব কর্মকাণ্ড ইরান করছে, সেগুলো আমেরিকার পরিকল্পনা। ইরানের একজন বড় খতিব ইরানের রাজধানীতে জুমার সালাতে বলেন: যদি ইরান না থাকত, তাহলে আমেরিকা আফগানিস্তানের নর্দমায় ডুবে যেত। ইরান আমেরিকার জন্য আফগানিস্তানের পথ সহজ করেছে এবং বর্তমান পর্যন্ত তাদের থাকার বন্দোবস্ত করেছে। আর বাকি রইল ইরানি রাষ্ট্রদূতকে গ্রেফতার করা, কিংবা ইরানের পারমানবিক স্থাপনার ক্ষেত্রের আমেরিকার বিরোধিতা করা, তার মূল কারণ হচ্ছে যেন ইরান আমেরিকার সাথে কৃত শর্তগুলো যথাযথ আদায় করে, এ জন্যই তাকে চাপে রাখা । আফগানিস্তানে আমেরিকান প্রকল্প বাস্তবায়নে শিয়ারা তাদেরকে সহযোগিতা করছে। এ জন্য বিশ্বের শিয়াদের বলছি, তাদের নামে যা প্রচার করা হচ্ছে, তার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইরানের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য শিয়া এবং ইসলাম উভয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[1]

---

[1] সাক্ষাতকারটি এখানেই শেষ করছি, তবে আমরা কতক প্রশ্ন বাদ দিয়েছি, যার সাথে কিতাবের সম্পর্ক নেই।

হাসান নাসরুল্লাহ ও তার অনুসারীদের থেকে সতর্ক থাকুন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যে এবং সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর এবং তার পরিবার ও সকল সাথীর উপর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣ ﴾ [الانعام: ١٥٣]

“আর এটা তো আমার সোজা পথ, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ কর না, তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর” ।[1] অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ [النساء : ١١٥]

“আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়েত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে,

---

[1] সূরা আন-আম: (১৫৩)

আমি তাকে ফেরাবে যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ”।[1]

সত্যকে গোপন করে ও সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করে মানুষকে গোমরাহ করতে আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন| তিনি ইরশাদ করেন:

﴿ وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤٢ ﴾ [البقرة: ٤٢]

“আর তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন করো না”।[2] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله».

“আমি তোমাদের নিকট দু’টি বস্তু রেখেছি, যাবত তা আঁকড়ে থাকবে গোমরাহ হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নত”। তিনি অপর স্থানে বলেন:

«سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصدَّق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة» قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلَّم في أمر العامة».

---

[1] সূরা আন-নিসা: (১১৫)

[2] সূরা বাকারা: (৪২)

“মানুষের উপর একটি যুগ আসবে ধোঁকায় পরিপূর্ণ, যেখানে সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলা হবে, যাতে খিয়ানতকারীকে আমানতদার আর আমানতদারকে খিয়ানতকারী গণ্য করা হবে। আর তাতে কথা বলবে: ‘রুআইবাদাহ’। বলা হল: ‘রুআইবাদাহ’, তিনি বললেন: ইতর শ্রেণীর লোক, সে জাতীয় বিষয়ে কথা বলবে”। এসব আয়াত ও হাদিস এতটাই স্পষ্ট যে, ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ রাখে না। সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কুরআন ও হাদিস বুঝেছেন, সেভাবে কুরআন ও হাদিসকে আঁকড়ে ধরার তাগিদ বহু আয়াত ও হাদিসে এসেছে। নানাভাবে তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কখনো কারো সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক ছিন্নের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসকে আঁকড়ে থাকার আহ্বান করা হয়েছে। কখনো কুরআন-হাদিস ব্যতীত কারো কথা, কর্ম, মতামত ও বন্ধুত্বকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সিরিয়ার (শাম) অঞ্চলে ইয়াহূদী ও এক শ্রেণীর লোকের সাথে দক্ষিণ লেবাননে যুদ্ধের নামে যা চলছে, যারা নিজেদেরকে ‘হিযবুল্লাহ’ অথবা ‘ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন’ বলে, এগুলো অবশ্যই ফিতনা ও পরীক্ষার বস্তু, যার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের আকিদা এবং কিতাব ও সুন্নার সাথে তাদের সম্পর্ককে যাচাই

করছেন, যার উপর ছিল এ উম্মতের পূর্বসূরি ও তাদের অনুসারীগণ।

এ ফেতনায় অনেকে নিমজ্জিত হয়েছে । তারা ধোঁকা খেয়েছে হাসান নাসরুল্লাহ ও তার অনুসারীদের ইয়াহূদীদের সাথে যুদ্ধের নামে প্রতারণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করে অথবা তার নাটক দেখে । যারা তাওহীদ, ইসলাম এবং সম্পর্ক রাখা ও ছিন্ন করার নীতি জানে না, জানে-না হাসান নাসরুল্লাহ ও তার দলের আকিদা-বিশ্বাস, তারাই বেশী ধোঁকা খেয়েছে।

রাফেযীদের ফিতনা খুব কঠিন, যার সামর্থ্য আছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জরুরি, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা ও তাদের প্রকৃত অবস্থা বলে দেওয়া জরুরি। আল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপর সন্তুষ্ট হোন, তিনি বলেছেন:

لست بالمخادع ولا يخدعني المخادع

“আমি ধোঁকাবাজ নয়, কোনো ধোঁকাবাজ আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না”। ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

«فكان عمر رضي الله عنه أورع من أن يَخدَع، وأعقل من أن يُخدع»

“ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মুত্তাকী ও পরহেজগার ছিলেন, এ জন্য তিনি কাউকে ধোঁকা দিতেন না, আর তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার ছিলেন, এ জন্য তাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারত না”।[1] হলুদ সাংবাদিকতার কারণে অনেক ঘটনাই পাল্টে যায়, মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে না, তাদের মাঝে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, যাতে জনসাধারণ ব্যতীত শিক্ষিতরাও আক্রান্ত হয়, বরং দীনদার লোকদেরও তা প্রতারিত করে । আমরা দেখছি জিহাদ ও মুজাহিদ সম্পর্কে সংবাদগুলো কিভাবে পরিবর্তন করা হয়। আমরা দেখছি, যেসব মুজাহিদ অধিকৃত দেশ, আফগানিস্তান ও চেচনিয়ায় যুদ্ধ করছে, তাদেরকে বলা হয় সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদ। অথচ দক্ষিণ লেবাননে হিযবুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধকে শরয়ী ও বৈধ জিহাদ বলা হচ্ছে। নিশ্চয় এটা অপবাদ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাতে রয়েছে:

«إن وراءكم سنوات خداعات يصدَّق فيها الكاذب ويكذَّب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخوَّن فيها الأمين...» الحديث.

“নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে ধোঁকায় পরিপূর্ণ যুগ, যেখানে সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলা হবে।

---

[1] দেখুন: الروح (পৃ.২৪৪)

খিয়ানতকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে খিয়ানতকারী গণ্য করা হবে...”।

হিযবুল্লাহ ও হাসান নাসরুল্লাহ নামে মুসলিমদের উপর যে আপদ ও ফেতনা চেপে বসেছে, তা প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি:

প্রথম ধাপ:

আমরা পূর্বে যে আয়াত ও হাদিসগুলো উল্লেখ করেছি, তার দাবি হচ্ছে আমরা আমাদের আকিদা, সমঝ, চিন্তা ও গবেষণার কেন্দ্র বানাবো কুরআন ও সুন্নাহকে । কুরআন ও সুন্নাহকে যে আঁকড়ে ধরবে ও তার নুরে পরিচালিত হবে, সে কখনো গোমরাহ হবে না, ডান-বামের ফেতনায় পতিত হবে না।

তাদের অবস্থা দেখে আমাদের অবাক লাগে, যাদের সাথে রয়েছে কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবিদের আমল, তারা কিভাবে তা ত্যাগ করে আবেগ ও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়?!

كالعيسِ في البيداء يقتلها الظما   والمـاءُ فوق ظهورها محمولُ

“মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়, পিপাসা যাকে হত্যা করে, অথচ পানি তার পিঠের উপরই রাখা ছিল”।

আমরা নিম্নে কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে, তাওহীদ ও শিরকের আলোকে এবং হিদায়েত ও গোমরাহির আলোকে ফেতনা সৃষ্টিকারী হাসান নাসরুল্লাহ ও তার দল সম্পর্কে সামান্য আলোচনা

করছি, যাতে আমাদের সামনে হাসান ও তার দলের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়। আসলেই কি সে সত্যের উপর আছে, যা আল্লাহ ও তার রাসূল পছন্দ করেন, কিংবা বাতিলের উপর আছে, যার দিকে শয়তান ও তার দলবল আহ্বান করে?! সাথে সাথে আমরা তার ও তার দলের জিহাদ এবং ইয়াহূদীদের সাথে তাদের শত্রুতার বাস্তবতা সম্পর্কেও জানব... সে আসলেই আল্লাহর রাস্তায়, না তাগুতের রাস্তায়?! আল্লাহ তাওফিক দাতা:

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে কুরআনুল কারিম ও স্পষ্ট নুর দ্বারা প্রেরণ করেছেন, যেন মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে, যার কোনো শরীক নেই। তার ভিত্তিতেই তিনি সম্পর্ক ছিন্ন ও সম্পর্ক রাখার বিধান রচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখতে হবে; শির্ক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তিনি তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শির্ক থেকে সতর্ক করেছেন। এ জন্য তিনি জিহাদের বাজার তৈরি করেছেন, যেন শির্ক না থাকে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা হয়।

হিযবুল্লাহ ও হাসান নাসরুল্লাহর দাওয়াত কি কুরআনের দাওয়াত, যার জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিগণ জিহাদ করেছেন?!

এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য প্রয়োজন হাসান নাসরুল্লাহ ও তার দলের আকিদা জানা, তাদের সম্পর্ক যাদের সাথে, তাদের মূল উদ্দেশ্য জানাও জরুরি।

কে এই হাসান নাসরুল্লাহ?

হাসান নাসরুল্লাহ ২১ আগস্ট, ১৯৬০ই. সালে লেবাননে জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর শিয়া জাফরি ধর্ম শেখার জন্য ইরাকের ‘নাজাফ’ সফর করেন। ১৯৮২ই. সালে লেবাননের বেক্কা প্রদেশে ‘হরকতে আমালে’র রাজনৈতিক দায়িত্বশীল ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয় তাকে। অতঃপর অল্প দিনের মাথায় ‘হরকতে আমাল’ থেকে পৃথক হয়ে ১৯৮৫ই. সালে হিযবুল্লাহয় যোগদান করেন ও বৈরুতে তার দায়িত্বশীল নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৮৭ই. সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সামরিক শাখার নির্বাহী নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৯২ই. সালে হিযবুল্লাহর সেক্রেটারি জেনারেল আব্বাস মুসাভিকে অপহরণ করা হলে তিনি পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৯৩ই. ও ১৯৯৫ই. সালে দু’বার তাকে পুনঃনির্বাচিত করা হয়।[1]

---

[1] দেখুন: مجلة الشاهد السياسي এর সাথে এক সাক্ষাতকারে তিনি নিজে এ জীবনী উল্লেখ করেছে, সংখ্যা: (১৪৭), তারিখ: ৩/১/১৯৯৯ই.

হাসান নাসরুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে আমাদের সামনে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়, সে শিয়া, রাফেযী ও আহলে সুন্নাহর বিদ্বেষ লালনকারী। তার ধর্ম হচ্ছে জাফরি দ্বাদশ ইমামিয়াহ, ইরানে যে ধর্মের প্রাধান্য রয়েছে। সে তার পক্ষাবলম্বন করে ও তার দিকেই দাওয়াত দেয়। তাই তাকে আরবের খোমেনি বলা হয়। কারণ সে আরবের ভূমিতে রাফেযী রাষ্ট্র কায়েম করার স্বপ্ন দেখে, যেরূপ খোমেনি ইরানে কায়েম করেছে। জাবালে লুবনানের সুন্নী মুফতি বলেন: "হিযবুল্লাহ হচ্ছে আরব রাষ্ট্রে প্রবেশ করার ইরানি রাস্তা"।

আমরা যদি জাফরি দ্বাদশ ইমামিয়া মতবাদ সম্পর্কে না জানি, তাহলে তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে, কারণ এটাই হাসান নাসরুল্লাহর দীন, যার প্রচার ও দাওয়াতের জন্য সে জিহাদ করে।

এ মতবাদের ভিত্তি হচ্ছে শির্ক ও কুফরির উপর, যারা তাদের কিতাব ও হাদিস সম্পর্কে জানে, তাদের নিকট এসব স্পষ্ট । অনুরূপ তাদের ওয়েবসাইট এবং হুসাইনি জশনে- জুলুস ও বাৎসরিক প্রোগ্রামগুলো দেখলে তাদের ব্যাপারে সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তাদের কতক আকিদা ও হাসান নাসরুল্লাহর বিশ্বাস নিম্নে পেশ করছি:

১. জাফরি শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের বিশ্বাস তাদের ইমামগণ মাসুম ও নিষ্পাপ। ইমামদের ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহ ব্যতীত তাদের ইবাদতও করে। হজের নিয়তে তারা ইমামদের কবরে যায়, তওয়াফ করে ও তাদের নিকট ফরিয়াদ তলব করে। তাদের বিশ্বাস ইমামগণ গায়েব জানেন এবং পৃথিবীর প্রতিটি অণু তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।[1]

২. তারা বিশ্বাস করে, কুরআনে বিকৃতি ঘটেছে, কুরআন অসম্পূর্ণ, প্রকৃত কুরআন তাদের অদৃশ্য ইমাম মাহদির নিকট আছে। তিনি যখন আসবেন, কুরআনও তখন আসবে। বর্তমান তারা আহলে সুন্নাহর কুরআন তিলাওয়াত করছে, তাদের আলেমদের নির্দেশ তারা এটাই তিলাওয়াত করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের কুরআন বের হয়।

কেউ হয়তো বলতে পারেন: কুরআনে বিকৃতি ঘটেছে, এ কথা তারা স্বীকার করে না। আমরা বলি: এ আকিদা তাদের মৌলিক কিতাবে বিদ্যমান, যেমন কুলাইনি রচিত “আল-কাফি” এবং তাবরাসি রচিত “ফাসলুল খিতাব”। কুলাইনি ও তাবরাসি তাদের ইমাম। যদি তারা কুরআনে বিকৃতির আকিদা অস্বীকার করে, তাহলে তাদের সাথে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করুক, যারা বলে

---

[1] দেখুন: ইমাম খোমেনি রচিত «الحكومة الإسلامية» গ্রন্থ।

কুরআনে বিকৃতি রয়েছে, যেমন এ দু'টি কিতাবের লেখকসহ অন্যান্য শিয়া আলেম। তাদেরকে তারা কাফের বলুক, কিন্তু এটা তারা কখনো বলেনি, বলবেও না!

তারা সাহাবিদেরকে গালমন্দ করে ও কাফের বলে, বিশেষ করে আবু বকর, ওমর ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ, তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তারা তাকে কাফের বলে ও তাকে অশ্লীলতার অপবাদ দেয়। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা কিভাবে এতো মিথ্যা রচনা করে!

৪. তাদের পুরাতন ও নতুন ইতিহাস সাক্ষী তারা ইয়াহূদী, খ্রিস্টানদের পক্ষ নেয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে। মুসলিম দেশে হামলার জন্য তারা যুগে যুগে কাফেরদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে ও তাদেরকে পথ দেখিয়েছে। আব্বাসি খিলাফতের যুগে বাগদাদে হামলার জন্যে শিয়াদের গুরু ইবনে আলকামি তাতারিদের সাথে যোগাযোগ করেছে ও তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেছে। অনুরূপ বর্তমান যুগে ইরাক ও আফগানিস্তান দখল ও তাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে আমেরিকান সৈন্যদের সাথে তারা যা করেছে, তাও কোনো সচেতন লোকের নিকট অস্পষ্ট থাকার বিষয় নয়। তারা এখনো আমেরিকার পক্ষে

গোয়েন্দাগিরি করে, তাদের নিরাপত্তা দেয় ও তাদের সাথে নিয়ে আহলে-সুন্নাহকে হত্যা ও গুম করে।

তাদের এ সকল কর্মকাণ্ড এখন আর গোপন নয়, পূর্বে যেরূপ গোপন ছিল। এখন তাদের নিজেদের স্বীকৃতিতে তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে, অথবা তাদের গোপন চুক্তিগুলো ফাঁস হওয়ার কারণে, কারণ এতে তাদের তাকিয়্যাহ ও মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। দ্বাদশ ইমামিয়া শিয়া রাফেযীদের এসব ঘটনা এখন স্পষ্ট, তাদের সাথেই সম্পৃক্ত হাসান নাসরুল্লাহ ও তার লাঞ্ছিত দল। অতএব এ ব্যক্তি ও তার দলের শ্লোগানে ধোঁকা খাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কখনো সে মুসলিম উম্মার পক্ষে প্রতিরোধ করে না, কখনো সে মুসলিম উম্মার স্বার্থে ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না, সে কখনো ইয়াহূদী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি নয়, সে কখনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না।

এ ব্যক্তি এসব শির্কি আকিদাসহ যদি সুযোগ পায় –আল্লাহ তাকে সে সুযোগ না দিন- সে অবশ্যই রাফেযী ও শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করবে, যার ভিত্তি হবে বড় শির্ক, সাহাবিদের গালমন্দ করা, আহলে-সুন্নাহকে কাফের বলা, তাদের ধ্বংস ও নির্মূল করা, বর্তমান ইরাকে যেরূপ হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلّٗا وَلَا ذِمَّةٗۚ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَتَأۡبَىٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨ [التوبة: 8].

“কীভাবে থাকবে (মুশরিকদের জন্য অঙ্গীকার)? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তাহলে তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে না, তারা তাদের মুখের (কথা) দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশ ফাসিক”।[1]

এদত সত্ত্বেও মুসলিমদের অনেক সন্তান আছে, যারা তাদেরকে বিশ্বাস করে, তাদের শরণাপন্ন হয় এবং তাদের বিজয়ের কামনা করে!..

আমরা কখন আমাদের অবচেতনা থেকে হুশিয়ার হব? কখন আমরা সম্পর্ক রাখা ও না-রাখা এবং মহব্বত ও বিদ্বেষের ভিত্তি কুরআনকে বানাবো?! কখন আমরা আবেগী শ্লোগান, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, অপপ্রচার ও অসত্য থেকে মুক্ত হবো?!..

দ্বিতীয় ধাপ:

কেউ বলেন: হাসান নাসরুল্লাহ ও তার দল বর্তমান ইয়াহূদীদের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়িয়েছে, যখন সকল রাষ্ট্র ও দল হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তারা ইয়াহূদীদের ক্ষতি করছে, যা খোদ ইয়াহূদীরা স্বীকার করে। আমরা কিভাবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করি, অথচ

---

[1] সূরা তাওবাহ: (৮)

তারা উম্মতে মুসলিমার পক্ষে দুশমনের সাথে লড়াই করছে?! আমরা কি ইয়াহূদীদের ক্ষতিতে খুশি না?!

এটা সংশয়, বরং ফেতনা কোনো সন্দেহ নেই। যারা বাহ্যিক অবস্থা দেখেন, আবেগি হৃদয় নিয়ে ভাবেন এবং হিযবুল্লাহর নীতি, আকিদা ও লক্ষ্য জানেন না, তাদের ব্যতীত কেউ এসব কথায় ধোঁকা খেতে পারে না।

এ সন্দেহ দূরীকরণে একটু ব্যাখ্যা করে বলছি:

প্রথমত: ইয়াহূদীদের যে অনিষ্টই স্পর্শ করুক তাদের ব্যক্তিতে ও সামরিক ঘাটিতে আমরা তাতে খুশি। তবে প্রতারিত হয়ে, ইতিহাস ভুলে ও আবেগে তাড়িত হয়ে এভাবে বলা ঠিক নয়: “যে কেউ ইয়াহূদীদের মারুক, তারা আমাদের ভাই ও বন্ধু”। বরং কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, কে তাওহীদ ও সুন্নতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেমন ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইয়েরা রয়েছে, তাদেরকে পৃথক করব, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা গড়ে তুলব, পক্ষান্তরে যে তাওহীদের উপর নেই, তাওহীদ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্য লালন করে, আমরা তার সাথে বন্ধুত্ব করব না এবং তাকে সাহায্যও করব না। যদিও শত্রুকে মারার কারণে খুশি হব, কারণ শত্রু দুর্বল হচ্ছে, অনুরূপ শত্রুপক্ষ তাকে মারার কারণেও খুশি, যেন শির্ক ও কুফর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। আমাদের জবান বলে: হে আল্লাহ তুমি জালেমদেরকে জালেম দ্বারা ধ্বংস

কর এবং তাদের মাঝখান থেকে তাওহীদপন্থীদের নিরাপদে বের করে আন। আমরা যখন বলি: রাফেযীদেরকে শত্রু পক্ষ মারলে খুশি হই, তার উদ্দেশ্য তাদের আস্তানা ও ঘাঁটি, সাধারণ মুসলিম, শিশু, নারী ও নিরপরাধ মানুষ কখনো নয়। এতে আমরা দুঃখিত হই, খুশি হই না।

দ্বিতীয়ত: অত্র এলাকায় ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার খেলা চলছে, যা খেলছে ইরান ও সিরিয়া। তারা হাসান নাসরুল্লাহ ও তার দলকে সাহায্য করে এবং তারাই হিযবুল্লাহকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঠেলে দেয়। এ ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার মূল কারণ:

১. অত্র এলাকাকে কেন্দ্র করে ইরানের বিরাট পরিকল্পনা ও প্রোগ্রাম রয়েছে, সেই পরিকল্পনাই তারা বাস্তবায়ন করতে চায়। আমেরিকা, সাফাভি (ইরান) ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় যখন থেকে ইরাক দখলের পায়তারা করছে, সেই থেকে ইরানের তৎপরতাও দ্রুত বর্ধিত হচ্ছে। কয়েক মাস পূর্বে দামেস্কে ইরান ও সিরিয়ান সামরিক সহায়তার চুক্তি হয়, তার সাথে হিযবুল্লাহ ও ফিলিস্তিনি কয়েকটি গ্রুপ যোগ দেয়। এ দিকে ইরাকের কয়েকটি শিয়া গ্রুপ তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। তাদের নতুন চুক্তি ক্যান্সারের ন্যায় বিভিন্ন জায়গায় জড়িয়ে পড়ছে, মুসলিম উম্মাহর উপর যার অনিষ্ট ইয়াহূদীদের থেকেও মারাত্মক। এ পরিকল্পনার পক্ষে মুসলিমদের সমর্থন লাভ ও তাদের এলাকায় দ্রুত তার

প্রচারের জন্য ফিলিস্তিনি ঘটনা ব্যতীত উত্তম কোনো ঘটনা নেই। তাই ফিলিস্তিনকে তুরুপের তাস ও খেলনার গুটি বানানো হয়েছে, যার পশ্চাতে রয়েছে ইরানি সাফাভি সম্প্রদায়ের খবিস উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, যাদের আকিদা ও মূলনীতিসমূহ আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবি ও ইসলামি বিশ্বে শিয়া সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার করা, যার সূচনা হয়েছে শাম ও ইরাকের উর্বর ভূমি থেকে। অতঃপর ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বে তার বিস্তার ঘটানো।

তৃতীয়ত: লেবাননি রাফেযী ও ইয়াহূদীদের মাঝে কেন হঠাৎ ঝগড়া বাঁধলো, তার কয়েকটি ব্যাখ্যা তারা পেশ করে:

১. ইরাকে শিয়াদের ‘সুন্নী মুক্ত আন্দোলন’ তীব্রতর করা, যা বাস্তবায়ন করছে ইরাকি শিয়া মিলিশিয়া। ফিলিস্তিনি অধিবাসীদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধ্বংস-যজ্ঞ এবং দক্ষিণ ইরাকে সুন্নিদেরকে নির্বাসনে পাঠানোর আন্দোলন তো চলছেই, যার ফলে ‘বসরা’তে মাত্র ৭% পার্সেন্ট সুন্নী মুসলিম অবশিষ্ট আছে, অথচ কয়েক দশক আগে সেখানে মুসলিমদের আধিক্য ছিল। আমেরিকার ইরাক দখলের সময়ও সেখানে ৪০% পার্সেন্ট সুন্নী মুসলিম ছিল। এর মাঝে ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদের মিথ্যাচারও প্রকাশ পেল, যার বাণী ছিল: “ইসরাইলের অস্তিত্ব নিঃশেষ কর এবং শয়তানে আকবর আমেরিকার সাথে জিহাদ কর” । এ দিকে

সত্যিকার মুজাহিদ আহলে-সুন্নাহ আফগানিস্তান, ইরাক ও চেচনিয়ায় যুদ্ধ করে সততার স্বাক্ষর রাখছে । অনুরূপ ফিলিস্তিনি সুন্নী মুজাহিদরা দুনিয়াকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে একমাত্র তারাই যুদ্ধের ময়দানে আছে। বিশ্বের দৃষ্টিতে হিযবুল্লাহ শুধু একটি নাম সর্বস্ব সংগঠন ছিল, ফিলিস্তিনি আন্দোলনকারী মুজাহিদরা বাহাদুরি প্রদর্শন করে ইসরাইলকে অপমান করেছিল। পক্ষান্তরে হিযবুল্লাহ ইয়াহূদীদের সাথে গোপনে চুক্তি করেছিল, তারা শুধু ইসরাইলের ভাড়াটিয়া গোলাম। অতএব এমন কোনো আমল করা জরুরি ছিল, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, হিযবুল্লাহও ইয়াহূদী বিরোধী, তারও প্রয়োজন আছে। এ জন্যই দু’জন ইসরাইলি সৈন্য অপহরণ করার নাটক করল।

২. ইরাকি প্রতিরোধ আন্দোলনকারী সুন্নিরা যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন ইরান আমেরিকার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলছে, হিযবুল্লাহও তাতে যোগ দিচ্ছে। ইরাকি শিয়া মিলিশিয়ায় হিযবুল্লাহ অনুপ্রবেশ করছে ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। সবাই ইরাকের আহলে-সুন্নাহকে নিঃশেষ করার চক্রান্তে লিপ্ত, ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

৩. সিরিয়া ও লেবাননে শিয়া আক্রমণ নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল, কারণ জনগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত ইয়াহূদী ও আমেরিকার সাথে

ইরানের সমঝোতা সবাই জেনে গেছে। আরেকটি কারণ ছিল, ইরাকে আমেরিকা-ইরানি স্বার্থে কিছু মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। ইত্যাদি কারণে খুব জরুরি হয়েছিল এমন কোনো কাজ করা, যার ফলে বিশ্বের দৃষ্টি হিযবুল্লাহর দিকে ধাবিত হয় ও ইরাক-ফিলিস্তিনে সংগঠিত শিয়া নৃশংসতা মানুষ ভুলে যায়। অনুরূপ ফিলিস্তিনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সফলতাও মুছে যাক, যাদের সামনে ইসরাইল অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েছিল। তাই শিয়া তাবলীগী কাজকে প্রাণ দেওয়ার জন্য এরূপ করা জরুরি ছিল। অপর দিকে আহমাদিনেজাদের চটলাদার শ্লোগান: “ইসরাইল নামক রাষ্ট্র মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা জরুরি” এবং “ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য” মানুষ ভুলতে বসেছিল, পুনরায় তাও চালু করা প্রয়োজন দেখা দিল । আবার ইরাকের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী হিযবুল্লাহর অবস্থাও চাপা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। লেবাননের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসছিল, সেটাও বিনষ্ট করার প্রয়োজন ছিল, যার হুমকি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট দিয়েছে। এসব কারণেই একটি নাটক খুব জরুরি হয়ে পড়ে, যদিও সেটা লেবাননের বিনিময়ে... সমগ্র লেবানন... যদিও তার খেসারত সরকার ও সাধারণ জনগণ সবাইকে গুনতে হয়, তবুও এ রকম একটা ফিল্ম অবশ্যম্ভাবী ছিল। যদিও এ ফিল্ম ও খেলনা গুটি চালনার কারণে পূর্ণ লেবানন ধ্বংস হয়..!

এ জন্য... এবং এসব উদ্দেশ্য হাসিল করার নিমিত্তে হিযবুল্লাহ ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে তার দুঃসাহসিক ও দুর্দান্ত অপারেশনের মাধ্যমে ফিল্মের আয়োজন করে, কারণ সে ইরানি স্বার্থ বাস্তবায়নকারী তৃতীয় এজেন্ট!..

আমরা কি ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনার বিপক্ষে?!. না, কখনো না। আমরা দখলদার ইয়াহূদী অস্তিত্বে আঘাতকারী প্রত্যেক বিষয়ে খুশি হই, যা তাদেরকে দুর্বল বানায় ও মানুষের অন্তর থেকে তাদের ভীতি দূর করে। কিন্তু ধোঁকা খেতে চাই না, কিংবা চাই না ইয়াহূদীদের পরিবর্তে এমন শক্তি আগমন করুন, যারা ইয়াহূদীদের চেয়েও খারাপ। আমরা চাই না এই ফিল্মের আয়োজকরা ফিলিস্তিন নিয়ে ব্যবসা করুক, যখন বাগদাদে শিয়ারা ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে, তাদের রক্ত প্রবাহিত করছে, তাদের সম্পদ ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে...

আমরা কখনো বরদাশত করি না ইরান তার ঘৃণিত উদ্দেশ্যের জন্য সিরিয়া ও লেবাননের নিরাপত্তা বিনাশ করুক। আমরা বরদাশত করি না ইরানের এজেন্ডা বাস্তবায়নে হিযবুল্লাহ উসকানিমূলক কাজ করুক, আর তার বিনিময়ে ইসরাইল লেবাননের জনগণ, শিশু ও নারীদের হত্যা করুক। আমরা বরদাশত করি না নব্য ইরানিরা নিজেদের গায়ে মিথ্যার চাদর উড়াক ‘তারা প্রতিরোধকারী’, কারণ সবার সামনে ও ভর দুপুরে

তারা আমেরিকান ও ইয়াহূদী লক্ষ্য বাস্তবায়নে সদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা চাই না, ইরানি শিয়ারা আমাদের পরিবার ও মুসলিম ভাইদেরকে ইরাকে যেভাবে তারা হত্যা করছে, তার থেকে বিশ্ব দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিক। আমরা চাই না এসব ঘৃণ্য কাজের বিনিময়ে ইরান পারমানবিক অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম হোক, যা সে কুমতলব হাসিলের জন্য আরব ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, ব্যবহার করবে তাদের দেশ, ঐতিহ্য, সম্পদ ও সম্মানের বিপরীত!..

পুরো ইতিহাস তালাশ করুন, কোথাও পাবেন না শিয়ারা কখনো ইয়াহূদীদের সাথে যুদ্ধে কিংবা তার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, অথবা পাবেন না কখনো শয়তানে আকবরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে?! পূর্ণ ইতিহাসে একটি শব্দও পাওয়া যাবে না, যা তাদের দাবির স্বপক্ষে। বরং তার উল্টো পাবেন, যা ইরানকে লাঞ্ছিত করে, তার প্রমাণ তারা ইরাকের যুদ্ধে আমেরিকান ও ইয়াহূদীদের থেকে অস্ত্র আমদানি করেছে, যা ইরানি চাপাবাজদের গালে চপেটাঘাত, “যার নাম ইরানগেট ক্যালেঙ্কারি” । ইরান নব্য শিয়াদের উসকানি দিচ্ছে, সে আমেরিকাকে ইরাকের জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে এবং ইরান আমেরিকাকে ইরাকে দীর্ঘ দিন রাখার জন্য সাহায্য করছে। ইরান হিযবুল্লাহর মাধ্যমে লেবাননের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তার শান্তি ও

শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করছে। এ ইরান উপসাগরীয় দেশসমূহে উগ্রতার ইন্ধন দিচ্ছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের তিনটি দ্বীপ অন্যায়ভাবে দখল করে আছে। ইরান ফিলিস্তিনিদের আন্দোলনকে খেলনায় পরিণত করে, যখন ইচ্ছা তার দ্বারা সে খেলা শুরু করে, যার খেসারত দিতে হয় আরব ও ইসলামি ভূ-খণ্ডকে!

তৃতীয় ধাপ:

এই শেষ প্যারাতে আমরা আমাদের নফস ও মুসলিমদের থেকে নৈরাশ্য ও ভঙ্গুরতা দূর করতে চাই। পরিস্থিতি যদিও খুব সঙ্গিন ও দুঃখজনক, কিন্তু তা ভোর উদয়ের পূর্বাভাস। কারণ, আমরা দেখছি মুনাফিক ও অপরাধীরা ধীরে ধীরে লাঞ্ছিত হচ্ছে, মুমিনরা তার বিপরীতে সংগঠিত, শক্তিশালী হচ্ছে এবং তাদের সততার প্রমাণ দিচ্ছে। এটাই বাস্তব চিত্র, আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এরূপ হয়। কাফেররা ধ্বংস ও মুমিনরা শক্তিশালী হয়। তার আগে পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করণের মুহূর্তগুলো পার করতে হয়, যেন সত্যিকার মুমিন কাফের ও মুনাফিকদের থেকে পৃথক হয়, আর যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, সেও যেন আলাদা হয়। যে ধ্বংস হতে চায় বুঝে-শুনে ধ্বংস হোক, আর যে জীবিত থাকতে চায় বুঝে-শুনে জীবিত থাক। এটাই বর্তমান দেখা যাচ্ছে, এই বিভাজনের পূর্বে আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয় না।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আমাদের অন্তরে আশা জাগ্রত করে, অপরাধী ও তাদের ষড়যন্ত্রের ভয় দূরীভূত করে এবং আমাদেরকে তাদের মোকাবেলায় সাহসী করে দেয়, তা হল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٦ ﴾ [الانفال: ٣٦]

"নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, তারা নিজেদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাঁধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হবে এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরি করেছে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে"।[1]

এসব ঘটনার দ্বারা ইরান যে হীন স্বার্থ চরিতার্থ ও অত্র এলাকায় রাফেযীদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, হতে পারে ফলাফল তার বিপরীত হবে। হয়তবা শেষের শুরুটা তাদের অপরাধী কর্মকাণ্ড ও তাদের সমাপ্তির ঘোষণা হতে পারে। কারণ, আল্লাহর নীতি এটাই যে, সত্য ও তার পরিবার টিকে থাকবে এবং মিথ্যা ও তার পরিবার বিনষ্ট হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[1] সূরা আনফাল: (৩৬)

﴿ بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨ ﴾ [الانبياء: ١٨]

“বরং আমি মিথ্যার উপর সত্য নিক্ষেপ করি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিমেষেই তা বিলুপ্ত হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ তোমরা যা বলছ তার জন্য”।[1]

অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿ كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ وَٱلۡبَٰطِلَۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ ١٧ ﴾ [الرعد: ١٧]

“এমনিভাবে আল্লাহ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দেন। অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে, তা জমিনে থেকে যায়। এমনিভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন”।[2]

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদেরকে আহলে হক ও তার সাহায্যকারী হওয়ার তাওফিক দিন। মুসলিম উম্মার কাজগুলো শুধরে দিন, যেন তার সাহায্যকারী সম্মানিত হয় ও তার দুশমন বেইজ্জত হয়। এ সমাজে যেন সৎকাজের আদেশ

---

[1] সূরা আম্বিয়া: (১৮)

[2] সূরা আর-রা‘দ: (১৭)

করা হয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি দু’জাহানের প্রতিপালক।

ড. আব্দুল আযীয ইবনে নাসের আল-জুলাইল

তারিখ: ২৯/৬/১৪২৭হি.

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ফিলিস্তিন জয় করেছেন, যাদের আকিদা ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-কে লানত করা, তারা কখনো ফিলিস্তিন স্বাধীন করবে না।

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ ক্রান্তিকাল ও ব্যাপক যুদ্ধাবস্থা অতিক্রম করছে, ফলে তার শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে ও ঐক্য টুটে যাচ্ছে। তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে পাপাচারী কাফেররা, তারা মুমিনদের ব্যাপারে আত্মীয়তা কিংবা চুক্তির কোনো পরোয়া করে না।

ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি আজ আহত, তার সকাল ও সন্ধ্যা হয় শিশুদের চিৎকার, বন্ধী জীবনের অসহায় ফরিয়াদ, নির্যাতনের আর্তনাদ, সন্তানহারাদের বিলাপ ও ইয়াতিমদের করুন কান্নার তিক্ততার মধ্য দিয়ে।

সকাল-সন্ধ্যায় ফিলিস্তিন আজ প্রত্যক্ষ করছে সারি সারি লাশ, কাঁধের উপর জানাজা, ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর, সম্মানহানি, আরো অনেক ঘটনা, যা দেখে অন্তর ব্যথিত হয়, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটে ও শরীর শিউরে উঠে।

দাজলা ও ফুরাত তীরের মাটি খ্রিস্টান ও রাফেযীদের যাঁতাকলে আজ পিষ্ট, আল্লাহর নিকট সে ফরিয়াদ করছে। তার বাড়ি-ঘর ধ্বংস করা হয়েছে, মসজিদগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, তার সম্মান

ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, তার জমিনে উড্ডীন হয়েছে খ্রিস্টানদের পতাকা।

এসব ঘটনাপ্রবাহ মুসলিমদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে ও যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে, চিৎকার করে ডাকছে ও সাহায্য তলব করছে। কেউ কি আছ, এ ডাকে সাড়া দিবে?! কেউ কি আছে আহত ও পঙ্গুদের সাহায্য করবে?

أحلَّ الكفر بالإسلام ضيماً   يطول به على الدين النحيبُ
فحقٌّ ضائع وحمى مُباح   وسيف قاطع ودم صبيبُ
وكم من مسلم أمسى سليباً   ومسلمة لها حرم سليبُ
وكم من مسجد جعلوه ديراً   على محرابه نُصب الصليبُ
أمور لو تأمَّلهنَّ طفل   لشارَ في مفارقه المشيب
أتُسبى المسلمات بكلِّ ثغرٍ   وعيش المسلمين إذاً يطيب
أما لله والإسلام حق   يدافع عنه شُبانٌ وشيبُ؟
فقل لذوي البصائر حيثُ كانوا   أجيبوا الله ويحكمو أجيبوا

১. কুফর ইসলামের মাঝে পেরেক ঢুকিয়েছে, তার দ্বারা সে ইসলামকে ক্ষতবিক্ষত করছে।

২. অধিকার বলতে কিছু নেই, ঘরগুলোও অরক্ষিত; তলোয়ার কেটে চলছে, রক্তও প্রবাহিত হচ্ছে।

৩. হিসেবে নেই কত মুসলিম গুম হয়েছে, আর কত মুসলিম নারীকে অপহরণ করা হয়েছে।

৪. হিসেবে নেই কত মসজিদ গির্জা বনেছে, আর কত মেহরাবে ক্রুশ উঠেছে।

৫. এমনি ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে, যদি শিশুও চিন্তা করে তার চুল পেকে যাবে।

৬. এভাবে মুসলিম নারীদের পতিতা বানানো হবে, আর মুসলিম আরামে নিদ্রা যাবে?

৭. মনে রেখ, আল্লাহ ও ইসলামেরও হক আছে, সে হক-কি যুবক-বৃদ্ধ আদায় করবে?

৮. প্রত্যেক বিবেকী ও হুশিয়ার ব্যক্তিকে বলে দাও, আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও।

এসব রক্তাক্ত ঘটনা, দুঃখজনক ট্রাজেডি, চলমান বিপর্যয়ের মধ্যে মুসলিমরা বেদনাদায়ক বাস্তবতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। কোনো মুক্তিদাতা আছে কি, যে উম্মতকে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করবে, কোনো নেতা আছে কি, যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, শত্রুদের হামলা ও রক্তপাত বন্ধ করবে।

এসব অবস্থায় যখন মুসলিমকে কেউ ডাকে, আবার মুসিবতও তাকে ঘিরে ধরে; তখন সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়, কে দোস্ত ও দুশমন পৃথক করতে পারে না। যে সম্মানের উপযুক্ত নয় তাকে সম্মান করে, যে সম্মানের উপযুক্ত তাকে সম্মান করে না। অতঃপর যখন অন্ধকার কেটে যায় ও সম্পূর্ণ আলোকিত হয়,

তখন আফসোস করে হাতের আঙ্গুল কাটে, কিন্তু সে কাটায় কোনো ফায়দা নেই।

আমরা আহমদ শাওকির কবিতা ভুলব না, সে কামাল আতাতুর্কের প্রশংসায় কবিতা আবৃতি করেছিল, তাকে আঙ্কারার মুকুট ও আলস্য ত্যাগকারী ঘোষণা করেছিল, যে খেলাফত ও রাজত্ব ধ্বংস করেছিল। কামাল যখন গ্রীসের সাথে যুদ্ধের নাটক করেছিল, তখন আহমদ শাওকি তাকে উদ্বুদ্ধ করে বলেছিল:

الله أكبر كم في الفتح من عجبِ   يا خالد الترك جدِّد خالد العربِ
يومٌ كبدر فخيلُ الحق راقصة على   الصعيد وخيل الله في السحب

“আল্লাহু আকবার, বিজয়ের মধ্যেও অনেক আশ্চর্য বিষয় আছে, হে তুর্কের খালেদ, তুমি আরবের খালেদ ইবন ওয়ালিদ বনে যাও। বদরের দিনের ন্যায় একটি দিন উপহার দাও, কারণ সত্যের ঘোড়াগুলো ময়দানে ছুটোছুটি করছে, আর আল্লাহর ঘোড়াগুলো ময়দানে প্রস্তুত রয়েছে”।

কিন্তু আহমদ শাওকি মাথায় হাত রেখে বসে পড়ল, যখন জানল যে, কামাল খালেদ ইবনে ওয়ালিদের স্মৃতি চারণের পরিবর্তে তুর্ক-আরবদের সম্মান বিনষ্ট করেছে।

এসব ক্ষেত্রে দুঃখজনক হল, মানুষ সবার কথাই শুনে, প্রত্যেক পতিত ব্যক্তিই জাতীয় বিষয়ে কথা বলে, ফলে নিজে গোমরাহ হয়

ও অপরকে গোমরাহ করে, বরং যারা প্রকৃত দা‘ঈ, কিতাব ও সুন্নাহর ইলমের অধিকারী মানুষ তাদের নিয়ে উপহাস করে। ফেতনা যতই বর্ধিত হোক, মানুষের ব্যাপারগুলো যত ঘোলাটে হোক, বাতিলপন্থীদের আস্ফালন যত বৃদ্ধি পাক, আহলে হককে সত্য বলতেই হবে, ধর্মীয় বাণী মানুষকে শুনাতেই হবে; বাতিল, বাতিলের দা‘ঈ ও তার সাহায্যকারী দ্বারা মানুষ যতই প্রভাবিত হোক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلِتَسۡتَبِينَ سَبِيلُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٥٥ ﴾ [الانعام: ٥٥]

“আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়”।[1] অর্থাৎ: আমি আপনাকে তাওহীদের দায়িত্ব, রিসালাতের দায়িত্ব ও আকিদার দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করব, যেন মিথ্যা থেকে হক স্পষ্ট হয় এবং বাতিল থেকে হিদায়েত পৃথক হয়। তাই প্রত্যেক দা‘ঈ, ইলম অনুসন্ধিৎসু ও আলেমের দায়িত্ব, মানুষকে তার পানীয় ও খাদ্যস্থান বাতলাতেই হবে।

সন্দেহ নেই, ফিলিস্তিন ও লেবাননে ইয়াহূদীরা যা করছে, তা কোনো শরীয়ত বৈধতা দিতে পারে না, কোনো বিবেক তা সমর্থন করতে পারে না, যার অন্তরে রূহ আছে, সে তার উপর সন্তুষ্টি

---

[1] সূরা আন-আম: (৫৫)

প্রকাশ করতে পারে না। তবুও সত্য বলে যেতে হবে, প্রতারক দা'ঈদের থেকে সতর্ক করতে হবে, যারা হকপন্থী দা'ঈদের অনুপস্থিতে চটলাদার শ্লোগান দেয়, কিন্তু তারা অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ ও কুফরি গোপন করে, তাদের থেকে সতর্ক করতে হবে। একটি ভুল ধারণা হল, কেউ যখন রাফেযী ও তাদের অনিষ্ট থেকে সতর্ক করে, তখন মানুষ মনে করে সে ইয়াহূদীদের পক্ষ নিচ্ছে ও তাদের কাতারে দাঁড়াচ্ছে, অথবা তাদের কৃতকর্মের প্রতি সমর্থন দিচ্ছে, যারা [ইয়াহূদীরা] যুদ্ধের সময় নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের রেহাই দেয় না। সেও তাদের ন্যায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ ও তাদের রক্ত দেখে বিচলিত হয় না। এটা ভুল ধারণা, কারণ ইসলাম হচ্ছে রহমতের দ্বীন, তার অনুসারী কখনো কোনো দুশমনের সাথে হয়ে   নিরপরাধ মানুষ হত্যা করতে পারে না, কিংবা যারা যুদ্ধ করে না তাদের উপর সীমালঙ্ঘন করতে পারে না।

আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين».

“আল্লাহর নামে, আল্লাহর তাওফিক চেয়ে এবং তার রাসূলের ধর্মের উপর রওয়ানা কর, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো নারীকে হত্যা করবে না, খিয়ানত করবে না, তোমরা তোমাদের গণিমতগুলো জমা কর, নিজেদের সংশোধন ও ইহসান কর, নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের মহব্বত করেন”।

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ রাবাহ ইবনে রবি‘ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা কোনো যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, তিনি দেখলেন লোকেরা একটি ঘটনায় একত্রিত হয়েছে। লোক পাঠিয়ে বললেন:

«انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: على امرأة قتيل فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلاً فقال: «قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً».

“দেখ, কি জন্য তারা একত্র হয়েছে”? তিনি এসে বলেন: একজন মৃত নারীর উপর, তিনি বললেন: “এই নারী যুদ্ধের জন্য আসেনি”। তিনি বলেন: অগ্রভাগে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বললেন: “খালেদকে বল, কোনো নারী ও মজদুরকে হত্যা করবে না”।

এ হল উদার ইসলামের শিক্ষা, এ থেকে প্রমাণিত হয় ইসলাম হচ্ছে রহমতের ধর্ম, এমনকি শত্রুর সাথেও। তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করে বলেই আমাদের জন্য বৈধ নয় তাদের হত্যা করব, তাদের উপর জুলম করব, অথবা কোনো উপায়ে তাদের উপর সীমালঙ্ঘন করব। অতএব যে আল্লাহ ও তার রাসূলের দুশমন, তার রাস্তা থেকে মানুষদের বিরত রাখে এবং মুমিনদের কষ্ট দেয়, কিন্তু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না, তাকে হত্যা করাও বৈধ নয়। তাওহীদের আকিদা যারা জানে তাদের উপর ওয়াজিব হিযবুল্লাহ ও শিয়া সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করা। বিশেষ করে যখন তাদের দ্বারা সেসব মানুষ ধোঁকা খায়, যারা তাদের আকিদা জানে না; এবং যখন তারা দাবি করে, আমরা ইসলামের সুরক্ষাদানকারী, মুসলিমের পক্ষে প্রতিরোধকারী এবং   তাওহীদের আকিদা ও ইসলামের জন্য যুদ্ধ করছি, যেন সত্যের সাথে মিথ্যা মিশে যায়, তখন সতর্ক করা বেশী জরুরি হয়। কারণ, অনেকে তাদের প্রতারণা দ্বারা ধোঁকা খায়, কতক জাহেল তাদের আকিদাকে সহি বলে ও তাদের প্রশংসা করে।

আমাদের এ যুগে সে অকুতোভয় আলেমের কথা স্মরণ করা শ্রেয় হবে, রাফেযীদের পূর্বপুরুষ হাকেম উবাইদির (আল-মুয়িয) সাথে যার তর্ক হয়েছিল। তিনি উবাইদির শ্লোগান, চটলাদার বক্তৃতা ও মিথ্যা আশ্বাসে ধোঁকা খাননি, তিনি সত্য কথা বলেছেন, কোনো

লুকোচুরি করেননি, যদিও তার জন্য তাকে জীবন কুরবানি করতে হয়েছে।

হাফেজ ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ স্বঘোষিত ফাতেমী হাকেম উবাইদির জীবনীতে বলেন: যখন সে আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ করে, মানুষ তাকে দেখতে আসে, তিনি সেখানে বাগ্মিতাপূর্ণ এক বক্তৃতা দেন: তিনি ঘোষণা করেন আমি জালেম ও মজলুমের মাঝে ইনসাফ করব। তিনি নিজেকে ফাতেমী বলে গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা উম্মতের উপর রহম করেছেন, অথচ তার ভেতর-বাহির ছিল রাফেযী আকিদা। যেমনটি কাযী আবু বকর আল-বাকেল্লানি বলেন: তাদের ধর্ম হচ্ছে শুধু কুফরি, তাদের আকিদা হচ্ছে রাফেযী, অনুরূপ তার সরকারের লোক, তার অনুসারী, তার সাহায্যকারী ও তার সাথে বন্ধুত্বকারী সবাই রাফেযী , আল্লাহ তাকে ও তার সাথীদেরকে ধ্বংস করুন।

একদা তার (হাকেম আল-উবাইদী, আল-মুয়েয এর) সামনে ইবাদতগুজার আবু বকর নাবুলসিকে হাজির করা হয়। উবাইদি তাকে বলেন: আপনার সম্পর্কে আমার নিকট সংবাদ এসেছে, আপনি বলেছেন: আমার নিকট যদি দশটি তীর থাকে, তাহলে তার নয়টি দ্বারা রোমের উপর আক্রমণ করব, আর একটি দ্বারা মিসরি তথা উবাইদীদের উপর আক্রমণ করব?

তিনি বলেন: আমি এরূপ বলেনি, তখন সে (মুয়েয) ভাবল তিনি (আবু বকর আন-নাবলুসী) তার কথা থেকে ফিরে গেছেন।

সে বলল: কিভাবে বলেছেন?

তিনি বললেন: আমি বলেছি: তোমাদেরকে নয়টি নিক্ষেপ করা উচিত, অতঃপর দশমটি তাদেরকে নিক্ষেপ কর উচিত, সে বলল: কেন?

তিনি বললেন: কারণ, তোমরা উম্মতের দীনকে পরিবর্তন করেছে, নেককার লোকদের হত্যা করেছ, আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিয়েছ, যা তোমাদের অধিকার নয় তাই তোমরা দাবি করেছ"।

একথা শোনার পর সে (মুয়েয) তাকে (আবুবকর নাবলুসীকে) প্রথম দিন মানুষের সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দিল, অতঃপর দ্বিতীয় দিন কঠিন বেত্রাঘাত করা হল, অতঃপর তৃতীয় দিন তার চামড়া ছিলে ফেলার নির্দেশ দিল। একজন ইয়াহূদীকে নিয়ে আসা হল, সে তার চামড়া ছিলছে আর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন: ইয়াহূদী বলেন, তার উপর আমার দয়া চলে আসল, তাই যখন তার কলব বরাবর পৌঁছলাম, ছুরি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেললাম। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন।

সেখান থেকে তাকে শহীদ বলা হয়, আর তার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয় আজ পর্যন্ত নাবুলসের বনু শহীদকে। এখনো তাদের মাঝে কল্যাণ বিদ্যমান।[1]

ফিলিস্তিন জয় করেছে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, যারা আকিদা ও দীন হিসেবে ওমরকে লানত করে, দ্বিতীয়বার তাদের হাতে ফিলিস্তিন মুক্ত হবে তা কখনো সম্ভব নয়।

আমি বলছি: কখনো না।

ফিলিস্তিনি ও অন্যান্য অধিকৃত মুসলিম ভূমি, একমাত্র ওমরের অনুসারীরাই মুক্ত করবে। যারা তার নামে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে, তার হিদায়েতের অনুসন্ধান করে ও তার অনুসরণ করে।

কিন্তু যারা সাহাবিদের শত্রু এবং যারা ওমরকে লানত করে, আল্লাহর কসম তারা উম্মতে মুসলিমার ধ্বংস ও অনিষ্টই বৃদ্ধি করবে, তাদের থেকে হতাশা ও লাঞ্ছনা ব্যতীত কিছুই আশা করা যায় না। যখন তাদের কর্তৃত্ব হাসিল হবে, তারা উম্মতকে গোস্বার দাঁত দেখাবে, উম্মতের রক্তে তারা তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন নিভাবে, তাদের জমিনকে হালাল মনে করবে, তাদের ইজ্জতকে বিনষ্ট করবে এবং তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করবে। এখন যেরূপ ইরাক ও ইরানে হচ্ছে।

---

[1] দেখুন: বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: (১১/৩২২)

তখন ঘুমন্তরা জাগ্রত হবে, অলসরা লজ্জিত হবে, কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পর।

অতএব যে তাওহীদের আকিদা জানে, ‘মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও কাফেরদের সাথে শত্রুতা করা’ আল্লাহর নির্দেশের উপর যার ঈমান রয়েছে, সে যেন অবশ্যই হিযবুল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের কথা ও নেতৃত্ব থেকে ধোঁকা না খায়। বাতিলপন্থীরা তাদের যতই গুণকীর্তন করুক। ইমাম আবু বকর নাবুলসি উবাইদিকে যেরূপ বলেছে, সেরূপ যেন রাফেযী হিযবুল্লাহকে বলে দেয়: আমাদের দায়িত্ব লাতের দলকে (হিযবুল্লাহকে) নয়টি তীর মারব, আর দশম তীরটি মারব ইয়াহূদীদেরকে।

ড. মুহাম্মদ আল-বারাক

[এখানে মূল কিতাবে কিছু প্রামান্য চিত্র ও দলীল রয়েছে তা দেখানো সম্ভব হলো না, প্রয়োজনে মূলগ্রন্থ থেকে দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল। (সম্পাদক)]

পরিসমাপ্তি

এ সংক্ষিপ্ত কিতাবে ‘হিযবুল্লাহ’ সম্পর্কে আমি যা জমা করার ইচ্ছা করেছি, তা এখানে পেশ করলাম। আশা করছি, যে হিদায়েত চায়, এতে তার জন্য হিদায়েত রয়েছে। আমি যদি লেখনীর কলমকে ঢিল দিতাম, তাহলে অবশ্যই আরো দীর্ঘ হত। তাদের গোমরাহি ও প্রতারণা আরো অন্তর্ভুক্ত হত, তবে আমি যা উল্লেখ করেছি, এগুলোই যথেষ্ট হবে অনুল্লেখ বিষয়ের জন্য। যে আরো অধিক ইচ্ছা করে, তার উচিত অন্যান্য লেখকদের কিতাব পড়া, তার অধিকাংশ ইন্টারনেটে আছে।

আমি তাকেই বলছি, যে সত্য চায় এবং যার অন্তর কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়।

আর যে হিযবুল্লাহর বাস্তব অবস্থা থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়, শুধু ইয়াহূদীদের সাথে তার যুদ্ধের দিকটাই দেখে, তার বিজয়ে হাতে তালি দেয় ও তার মুখে তার প্রশংসা করে, আমি তাকে বলব: হে অমুক, তুমি ইয়াহূদী রাষ্ট্র খতমের দোয়া করে ইসলাম ও মুসলিমের জন্য তার চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রের জন্য দোয়া করছ।

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلَّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

রাফেযী দ্বাদশ ইমামী শিয়াদের আকীদা বিশ্বাস ও তাদের কালো ইতিহাস ও অধ্যায় সম্পর্কে জানতে হলে আরও পড়ুন:

1- حقيقة المقاومة؛ المؤلف عبدالمنعم شفيق.
2- خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية؛ المؤلف عماد حسين.
3- أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين؛ المؤلف يوسف الشيخ عيد.
4- وجاء دور المجوس؛ المؤلف عبدالله الغريب.
5- (أمل) والمخيمات الفلسطينية؛ المؤلف عبدالله الغريب.
6- أحوال أهل السُّنة في إيران؛ المؤلف عبدالله الغريب.
7- الخميني والوجه الآخر؛ المؤلف زيد العيص.
8- الاعتداءات الباطنية على المقدسات الإسلامية؛ المؤلف كامل الدقس.
9- بروتوكولات آيات قم حول الحرمين؛ المؤلف عبدالله الغفاري.
10- الصفويون والدولة العثمانية؛ المؤلف علوي عطرجي.
11- الخمينية وريثة الحركات الحاقدة؛ المؤلف وليد الأعظمي.
12- حتى لا ننخدع؛ المؤلف عبدالله الموصلي.